প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

আবু সয়ীদ আইয়ুব

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের এই সংকলন। গানের সুর নয়, এ-লেখাগুলির প্রধান লক্ষ্য হলো গানের কথা। ধারাবাহিক কবিতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন যেমন বুঝে নেওয়া যায়, তেমনি তাঁর মনের এক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে তাঁর গানগুলিরও মধ্যে, যে-অর্থে অবনীন্দ্রনাথ ভেবে-ছিলেন 'রবিকার গানের মধ্যেই আছে তাঁর জীবনী।' সেই সম্পূর্ণ জীবনটি অবশ্য নয়, তার দু-একটি মাত্র অধ্যায়ের ইঙ্গিত রইল এখানে।

এ-অভিজ্ঞতা নিশ্চয় অনেকেরই হয় যে, এক গানের কথা থেকে মন চলে যায় অন্য গানের কথায়, আর তারপর দেখতে ইচ্ছে করে তাদের মিল-অমিলের খেলা। যেমন ধরা যাক, 'বাজিল কাহার বীণা' শুনেই কারো মনে হতে পারে 'কার বাঁশি বাজিল'র মতো অনেক পরবর্তী আরেকটিকে, ভাববার ইচ্ছে হতে পারে এ কি একই কথার দুই চেহারা, না কি ওই বাঁশি আর বীণা দিয়ে ধরা হলো গূঢ় কোনো ভিন্নতাকেও? হয়তো তখন আমাদের মনে পড়তে পারে যে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে গোটা একটি চিঠি জুড়ে শুনেছিলাম এক বীণার কথা, যে বীণা সৃষ্টির বীণা, আর তার একটি চিঠি পরেই ছিল আবার বাঁশিরও প্রসঙ্গ, যে বাঁশি কবির 'আমি'। 'যেমন বাঁশির ফাঁকের ভিতর দিয়ে সুর বেরয়, তেমনি আমার কুঁড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজ হচ্ছে বাণীর কাজ।' এ-ও এক সৃষ্টির আহ্বান, কিন্তু এর থেকে ঈষৎ স্বতন্ত্র হয়ে আছে আরেক আহ্বান, যেখান থেকে জগৎকে দেখেন তিনি 'একটি সহস্র তার বাঁধা বীণাযন্ত্রে'র মতো, যেখান থেকে গাইতে পারেন তিনি 'বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।' আর তখন, মনে হতে পারে যে ও-দুই গানের মধ্য দিয়ে ধরা হয়েছে যেন ভিন্ন দুই কথা।

অথবা যদি ভাবি বসন্তের কোনো গান : 'আজি দখিন দুয়ার খোলা।' এইরকমই তো উল্লাস আছে 'ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া'য় ? ওই-রকমই তো আবেগ জাগায় 'দখিন হাওয়া জাগো জাগো' ? কিন্তু লক্ষ করতে ভালো লাগে যে এর প্রথমটিতে আছে কেবল বহির্বসন্তের মহিমতা, দ্বিতীয়টিতে আছে 'আমি'র সঙ্গে তার যোগের ব্যাকুলতা, আর তৃতীয়টিতে যেন এসে যায় এ-যোগের তাত্ত্বিকতাও অনেকখানি, যখন শুনি 'নৃত্য তোমার চিত্তে আমার মুক্তিদোলা করে যে দান।' লক্ষ করতে ভালো লাগে যে এ-গানগুলির কালেরও দিক থেকে আছে যোগ্য এক পরম্পরা। প্রথমটি যদি ১৩১৭-এর গান, দ্বিতীয়টি লেখা হয়েছিল ১৩২১-এর ফাল্গুনে, আর ১৩২৯-এর ফাল্গুন হলো তৃতীয়টির রচনাকাল। নটরাজ-কল্পনার সময় যে আসন্ন হয়ে এল, তা বোঝা যায় এবার।

এ-ধরনের কৌতূহলের আরো অনেক বিস্তার নিশ্চয় সম্ভব, এখানে কেবল দু-একটির সূচনা আছে। আর এ-সূচনাগুলিও যে হতে পেরেছিল, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ কয়েকটি সংগীত-প্রতিষ্ঠানের কাছে। ঢাকার 'ছায়ানট' অথবা কলকাতার 'রবিরঞ্জনী' আর 'ইন্দিরা'র প্রশ্রয়েই লেখা হয়েছিল এর বেশ-কয়েকটি প্রবন্ধ।

মর্ত্য কাছে স্বর্গ যা চায়

'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় মরণলোক থেকে উঠে আসতে পারি' : এক তরুণীর এই আবেগের বর্ণনা আমরা রবীন্দ্রনাথেরই কাছে শুনেছি একদিন। কবিটির তখন বয়স ছিল অল্প, নিজেও সেদিন জানতেন না ভাবীকালের কত অগণন মানুষের সঞ্জীবনী তিনি তৈরি করে তুলবেন তাঁর গানে। জানতেন না তিনি, কত নিভৃত অবকাশে তাঁর কথা তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ে ভাববে কত লোক : 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে'। মরণের পরপার থেকে উঠে আসবার কথা বলেছিলেন ওই তরুণী, এক হিসেবে সেই কথাটির মূল্য অনেক, কিন্তু অন্যদিক থেকে আবার আমাদের বলতে ইচ্ছে হয় যে তাঁর গান আমাদের নিয়ে যায় যেন মৃত্যুরই কাছাকাছি, অন্তত জীবনমৃত্যুর এক আলোছায়াময় সন্ধিতে, যে-প্রদোষে দাঁড়ালে অল্পে-অল্পে খসে যায় আমার নির্জীবতা, দীনতা, তুচ্ছতা ; যার প্রলেপনে ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে আমার ভিতরকার আরো-একটা লঘুভার ছন্দোময় আমি। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের নিয়ে যায় প্রতিদিনের বাইরে এমনি এক ভারহীন অদীন ভুবনে, আমাদের নিবিড়তম সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের গান।

কয়েক বছর আগে, আমার কয়েকজন প্রবাসী কবিবন্ধু প্রায় একই সঙ্গে ফিরে এলেন দেশে। পুরোনো-সব বন্ধুরা মিলে পুনর্মিলনে বসা হলো একদিন, সন্ধ্যাবেলায়, বিদ্যুৎবিভ্রাটে সেদিন

ঘর ছিল অন্ধকার। সেই আবছা অন্ধকারে বসে আছেন 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার কবিদল, একদিন যাঁদের সবাই জেনেছিলেন কালাপাহাড় হিসেবে। এঁদের মধ্যে কেউ বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি পান না কিছু। কেউ-বা বলেন, পড়েননি তিনি রবীন্দ্রনাথ। সময় পেলে কখনো পড়ে দেখবেন হয়তো, এমন আশ্বাসও শোনান কেউ-কেউ। কিন্তু ওই সন্ধ্যায় যখন আর কথা নেই কোনো, যখন প্রস্তাব হলো গানের, অনিবার্যভাবে গলায় তখন উঠে এল রবীন্দ্রনাথেরই গান। আর, কোন্-সে গান? 'ওই আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব'। 'তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর' হবার সেই আত্মনিবেদনই গাইলেন একজন ফিরে-আসা বন্ধু, বিভোর হয়ে। খোলা প্রান্তর যেন চলে এল ঘরে, নিবিষ্ট হয়ে এল গোটা দলটি, সবারই গলায় একে-একে গুন্‌গুনিয়ে উঠল সুর, রবীন্দ্রনাথেরই সুর ;—সাম্প্রতিকের সঙ্গে তাঁর ঘোষিত ব্যবধান এক মুহূর্তে উড়ে গেল কোথায়।

এইরকমই হবার কথা। ভালেরি একবার বলেছিলেন : আলোয়-ধোয়া রাত্রি আর তার তারার পুঞ্জ পাল্‌টে দেয় মানুষের সব-কিছু। হাতের কাছে যা-কিছু আছে, সবই যেন অদৃশ্য হয়ে যায় তখন, ব্যাপ্ত এক সরলতায়-ভরে যাই আমরা। যেন, আমাদের পরিচিত একটা খোলস থেকে আমরা তখন সরে যাই, আমি আর না-আমির মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায় সব ভিন্নতা। রবীন্দ্রনাথের গানও যেন সেইরকম, এক মস্ত প্রাকৃতিক নিশীথিনী যেন, তার সামনে দাঁড়ালে বস্তুর সব ভার হাল্‌কা হয়ে যায় হঠাৎ, সরে যায় আমাদের সমস্ত মিথ্যে, সরে যায় সাজিয়ে-কথা-বলার সংসার।

কীভাবে সরে যায়? সুর নিশ্চয় তার একটা উপায়। এই সুর, রবীন্দ্রনাথ বলবেন, যেন ঠিক মানুষের গান নয়, যেন সমস্ত জগতের।

'পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকার অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গ-বিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি-নিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।' এই সুর তাহলে আমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায় সমস্ত কথার বন্ধন থেকে, সমস্ত দৈনন্দিন আবেষ্টন থেকে। কথা শুনতে-শুনতে কথা হারিয়ে যায় কখন, হঠাৎ আমরা টের পাই যে সুরের বেদনা কথাকে একটু সরিয়ে দিচ্ছে দূরে, কথাকে আর আমি লক্ষ করছি না তত। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই আবার কথার দিকে ভাষার দিকে ছবির দিকে ঘুরিয়ে আনেন কবি, এই হলো তাঁর ধরন। সুরের সঙ্গে ছবি এমনভাবে মেলে তাঁর গানে, এমনভাবে এর মধ্যে যাওয়া-আসা চলে কেবলই যে সব-মিলিয়ে যে-কোনো শ্রোতার ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতিতে লাগে টান। জেগে ওঠে আমাদের নিঃসীম আকাঙ্ক্ষা, আমাদের সমস্ত ভালোবাসা বুকের মধ্যে ঘনিয়ে আসে কখন, যুধিষ্ঠিরের রথের মতো জীবন থেকে সেই মুহূর্তে অল্প-একটু উঠে যাই যেন। 'ছিন্নপত্রে'র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে যেন একটি অশ্রুবাষ্পের আবরণ টেনে দিয়েছে কেউ।' তাঁর গানের কথাও যেন সেই সবুজ দৃশ্যাবলী, যার উপরে এক অশ্রুবাষ্পের আবরণ জড়িয়ে দেয় সুর।

এই আবরণের মধ্য দিয়ে বারেবারেই পৃথিবীকে দেখতে পায় যদি কেউ, সাহস করে সে তবে বলতে পারে: আমি কেউ নই। পরস্পর হানাহানিতে মত্ত কানাকানিতে কুটিল উচ্চাশার গ্লানিতে ভরা এই অপজীবন থেকে অনায়াসে উঠে দাঁড়াতে পারে সে, কেননা হঠাৎ সে টের পায় বিশ্ববিষয়ের অন্তঃসার, নিজেকে সে বলতে পারে

তাই সৃষ্টিছাড়া : 'পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে / জানিয়ে দে তাই'। কিন্তু এ কেমন সৃষ্টিছাড়া, যার দুয়ার নাড়া দিলেও সাড়া মেলে না কোনো? ঘর থেকে পথে বার করে আনবার ডাকই তো ছিল প্রত্যাশিত। এ কোন্ সৃষ্টিছাড়া যাকে কবি কোণেই থাকতে বলেন? এ হলো এক উলটো চলার ধরন। বাহিরদুয়ারে কপাট পড়ে যখন, ভিতরদুয়ার তখনই যায় খুলে। ভিতরের সেই খোলাদুয়ার দিয়ে এই পাগল বেরিয়ে পড়বে নিশ্চয়, তার আরেকরকম পথে। দেওয়া-নেওয়ার হিসেব শেষ হয়ে যাবে তখন, তার সমস্ত শরীর হাল্‌কা হয়ে যাবে, হয়ে উঠবে সুরময়। 'অচলায়তনে' পঞ্চকের যেমন মনে হতো প্রায়ই, অথবা যেমন সুদর্শনাও কখনো-কখনো অনুভব করেছে তার সমস্ত সত্তার মধ্যে। চারদিকে মেঘ নেমে এলে তার নিবিড় বেষ্টনের ভিতরে বসে-থাকা, অথবা কোনো দিক্‌-দিগন্ত খুলে-দেওয়া প্রান্তরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সায়ন্তনী বিষাদের আবির্ভাব দেখতে পাওয়া : এ-সব অভিজ্ঞতার কি কোনো বস্তুপ্রতিরূপ আছে কোথাও? কণ্ঠ ভরে জানিয়ে দিই : আমি পাগল ; আর অম্‌নি সেইসব নাম-না-জানা ভালোলাগার জগতের দিকে খুলে যায় সব গানের তরী, 'কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে, সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম পালটি তুলে।'

কেবলই একটি তরণীর কথা শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথের গানে, কেবলই শুনি যাওয়ার কথা। কিন্তু কোথায় যাব? কোন্ মরণ-লীলায়? কোকিল-ডাকা গ্রামের কোনো প্রাকৃতিক ছবিতে নয়, কোনো জনপদ-বধূর আকর্ষণ আর নয় এখন, এখন কেবল বলতে পারা চাই 'এবার বীণা তোমায় আমায় আমরা একা।' আমি যে চলি, আমি যে প্রতীক্ষা করি, সে কেবল এই তুমিটির জন্যে। এই

'তুমি'কে স্পর্শ করার মুহূর্তই হলো নিজেকে জানতে পাওয়ার মুহূর্ত।

আমার তো মনে হয়, সমস্ত শিল্পই এই নিজেকে জানার শিল্প। কেননা, এক হিসেবে, নিজেকে জানার সম্পূর্ণতাই সকলকে জানারও পাথেয়। এ ধারণার মধ্যে কেবল প্রাচীন উপনিষদকে খুঁজতে গেলে ভুল করব আমরা, এ আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় অর্জিত বোধ। আমরা দেখতে পাব যে আধুনিকেরাও কেবলই লড়াই করছেন এই আত্মবোধের সংকট নিয়ে। টমাস মানের মতো শ্রেষ্ঠ একজন আধুনিককেও বলতে হয় তাই : জীবনের প্রধান তিনটে বাণীর একটি হচ্ছে এই যে, মানুষ যখন সত্যি-সত্যি নিজেকে জানে তখনই সে হয়ে ওঠে আরেকজন মানুষ।

প্রতিদিনের মাঝখানে বসে আমরা সেই আরেকজন মানুষ হতে পারি না অবশ্য। হতে পারি না, কিন্তু হতে চাই। এক-একটা মুহূর্ত আমরা পেতে চাই যেখানে আমরা নিজের মধ্যেই দেখতে পাব এই আরেকজন মানুষকে। ইনি কোনো ঈশ্বর নন, ইনি কোনো অতিমানব নন, এ হলো আমার আমিরই মূল কেন্দ্র। সেই আমির দিকে আমার যেতে চাওয়ার এই বেদনা রবীন্দ্রনাথ জাগিয়ে তোলেন তাঁর কত গানে। তাই তাঁর এত প্রতীক্ষা, এত যাওয়া-আসা। যাওয়া-আসা শুধু ; এর কোনো ক্ষান্তি নেই, এর কোনো প্রাপ্তি নেই : 'কবে তুমি আসবে বলে' বসে থাকা নেই আর, আছে কেবল প্রতিশ্রুতি : 'আমি চলব বাহিরে'।

পুরোনো দিনের নাটকে মেটারলিঙ্ক তৈরি করেছিলেন অপেক্ষাতুর কয়েকটি অন্ধের চরিত্র, তারা বসে আছে তাদের ভাবী নিয়তির জন্য। অথবা তুলনায়-আধুনিক কাফ্‌কার কথা আমাদের

মনে করিয়ে দেন বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথের গানের অপেক্ষমান ছবিটির প্রসঙ্গে বা অমলের প্রতীক্ষার পাশাপাশি তাঁর মনে পড়েছিল কাফ্‌কার কোনো কোনো চরিত্রের কথা। কিংবা যেমন রিল্‌কে লিখেছিলেন একসময়ে : অনন্তকাল ধরে নেমে আসছে এক ভাবী সত্তা। কিন্তু কী এই সত্তাটির পরিচয়? কিসের জন্য এই প্রতীক্ষা? ভগবানের জন্যেই কি? অনেকের মতো বুদ্ধদেবও যেমন বলেন? সন্দেহ নেই যে স্পষ্টতই ঈশ্বরধ্যান রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো রচনার ভিত্তি, হতে পারে যে পরোক্ষেও অনেকসময়েই তাঁর রচনাকে ধরে আছে এই ঈশ্বরমুগ্ধতা : কিন্তু আজও পর্যন্ত আমাদের অনেকেরই মন ততখানি সাড়া দেয় না সেইসব গানে, যেখানে নিঃসংশয় তর্কাতীত এক ঈশ্বরেরই ভাবনা ভাবতে বাধ্য হব আমরা। অমল যে বসে থাকে তার রাজার চিঠি পাবে বলে, সেই বেদনাকে বুঝে নেবার জন্যে কোনো ধর্ম-ভাবুকতায় পৌঁছবার দরকার হয় না একেবারেই। জীবনকে যে ভালোবেসেছে, সে-ই কখনো-না-কখনো টের পেয়েছে এর বেদনা. দিনযাপনের প্রতিটি তুচ্ছ টুকরোও তার চোখে হয়ে ওঠে অপরূপ। তখন, যুগ-যুগ ধরে নেমে-আসা এই রূপের দিকে তাকিয়ে বলা যায়, আরেকটু বড়ো হলে হয়তো-বা বলতে পারত অমলও : 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে / আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে'!

এপার আর ওপার, মাঝখানে এক যোগ খুঁজে বেড়ানো! নীট্‌শে বলেছিলেন, মানুষ এক সেতুর মতো, অবমানব আর অতিমানবের মাঝখানে এক সেতু যেন সে। সে যে নিজে কোনো পরিণাম নয়, তার মধ্য দিয়েই অর্জিত হচ্ছে মস্ত কোনো পরিণাম, এইটেই নীট্‌শের মনে হয়েছিল মানবিক সাধনা। দুস্তর ব্যবধান

রবীন্দ্রনাথের জগৎ আর নীট্‌শের জগতে, কিন্তু এইখানে যেন দু'জন বলতে পারেন একইরকম কথা। কয়েকদিন আগে একজন মহিলা বলছিলেন 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে' গানটি একটু মেয়েলি। কথাটা মিথ্যে নয়, কিন্তু তখনই আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের এই বোধ যে আমাদের সবারই মধ্যে পুঞ্জ হয়ে আছে এক নারীসত্তা, এই নারীত্বই যেন তৈরি করেছে সেই সেতু। এই সেতুর উপর দিয়ে কবি নিজেকে সঁপে দেন তার রাত্রির হাতে, তাঁর সৃষ্টিশীলতার হাতে। খুবই নম্র তাঁর ভূমিকা, তাঁর ঘরটি শুধু ধুয়ে রাখবেন তিনি, আর অপেক্ষা করবেন এক আবির্ভাবের। ঠিক সেইরকমই শুনেছি আমরা আমাদের কবির গানে : 'আমার এ ঘর বহু যতন করে / ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে / আমারে যে জাগতে হবে / কী জানি সে আসবে কবে!' আমি আবারও বলতে চাই যে এর সঙ্গে ধর্মচেতনার কোনো অব্যাহত সম্পর্ক নেই, যদি-না বলি জীবনচেতনাই ধর্মচেতনা, যদি-না বলি শিল্প-চেতনাই ধর্মচেতনা।

রবীন্দ্রনাথের গান নিজেকে রচনা করে তুলবার গান। এ এক বিরামহীন আত্মজাগরণের আত্মদীক্ষার গান : অন্তত সেইখানে সে আমার কাছে ভালো। দীক্ষার এই বেদি থেকে প্রতিদিনের আত্ম-চরিতের দিকে তাকিয়ে দেখি। দেখি, এমন কোনো পদ্ম গড়ে ওঠেনি আমার স্বভাবের মাঝখানে যেখানে এসে পা রাখবে শ্রী, সৌন্দর্য। এই বোধ থেকে শুরু হলো কান্না, অপচয়ের অক্ষমতার অপূর্ণতার কান্না। হঠাৎ এক মস্ত গহ্বরের সামনে এসে পড়ি আমরা, উত্তরহীন সমাধানহীন এক প্রশ্নব্যাকুলতার তীব্র স্বাদ তাঁর গানে এসে লাগে কখনো। অন্ধকার পথে একলা পাগলের মুখে আর্তনাদ শুনি তখন :

'বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে'। 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে' : এই পাগলটিই শুধু আমাদের মতো একজন, যে জানে না কোনো শেষকথা, যে বোঝে না কোনো শেষকথা, বুঝতে চায় কেবল। অস্তাচলের আকাশ দেখে এর মনে হয় না যে কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ, মনে হয় না এ কোনো সোনার বিবাহসাজ, বরং এ দাবি করে : 'আমারে তার অর্থ শেখা'। এই পাগলটির উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে তাই মথিত হয়ে ওঠে আমাদের সমস্ত আধুনিক কাতরতা।

সব সময়ে যে এ কাতরতা অতিপ্রকাশ্য, তা নয়। তা হলে সে হয়ে উঠত এক ভাবালু বিলাপ মাত্র। এই কান্নারও আছে এক অভিজাত সংবরণ। আমার অনেকসময়ে মনে হয়েছে যে অতুলপ্রসাদে এই ব্যথা আর সমর্পণ যেন সংবরণের সীমা ছাড়িয়ে যায়, একটু দূরে সরে যায় আমার রুচি থেকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দুঃখের ভুবনকে এমন সন্তর্পণেই গড়ে তোলেন যে আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো ধীমান্ ভাবুকেরও মনে হয় যে দুঃখের চেয়ে আনন্দের গানই তাঁর বেশি। নিছক তথ্যের দিক থেকে কথাটা সত্যি নয় অবশ্য। সমগ্র গীতসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ দুঃখেরই কথা বলতে চেয়েছেন বারবার, সেইটেই স্বাভাবিক ছিল তাঁর পক্ষে, কেননা দুঃখই তাঁর নিজেকে রচনা করে তুলবার পথ। কিন্তু সেই দুঃখের বোধ কোথাও দমিয়ে দেয় না আমাদের, এমনই আলতোভাবে বলেন তিনি : 'হলো না তার ফুটে ওঠা / কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা'।

'মর্ত্য কাছে স্বর্গ যা চায়' এই শব্দক'টি শুনবার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যর্থতার মধ্যেও এক স্পর্ধা এসে মেশে। আমি পাইনি, আমি পারিনি, এই বোধটা থেকে যায় ঠিকই। কিন্তু ওরই সঙ্গে মনে হয়,

যা আমার পারবার কথা ছিল সে তো তুচ্ছ নয়, সে যে মস্ত বড়ো। আমি যে কেবল হাত পেতে নিই না, আমি যে দিতেও পারি কিছু, এই গর্বটা তখন জেগে ওঠে বুকে। মনে পড়ে 'শারদোৎসব' নাটকের উপনন্দকে। তাকে কি বলব দুঃখী? হয়তো তাই। তাকে কি বলব সুখী? হয়তো তাও। পায়নি, এই হয়তো তার দুঃখ। কিন্তু তবু সে থেমে নেই, এই তার সুখ।

ভালেরি যখন বলেছিলেন যে দিনের প্রশস্ত আলোয় আমরা কেবল আমাদের কাজের সঙ্গে বাঁধা, তখন তিনি আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতার কথা বলেন। নক্ষত্রখচিত রাত্রির আলোয় মুছে গেছে সেই কাজের লোক; এখন 'man of action'-ই আর 'measure of things' হতে পারে না আর। ঘরে আধখানা আর বাইরে আধখানা করে নিজেকে বেঁধেছিল যে, সে আজ সহজ হাওয়ায় ভেসে যাবে। অশ্রুনদীর সুদূর পারে আছে সেই ঘাট, যেখানে হাটের লোক তার কথার ভার নিয়ে পৌঁছবে না, যেখানে নীরবতাই এক মস্ত আশ্রয়। এই আশ্রয়ের কাছে এসে বুঝতে পারি আমি: 'ঘরে আমার রাখতে যে হয় বহু লোকের মন' অথবা জানি 'কাটল বেলা হাটের দিনে / লোকের কথার বোঝা কিনে' কিংবা মেঘে-মেঘে দিন অন্ধকার হয়ে এলে মনে পড়ে 'কাজের দিনে নানা কাজে / থাকি নানা লোকের মাঝে / আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে।'

'তোমারি আশ্বাসে'! তুমি, তুমি। কে এই তুমি? এই শেষ গানটি যে প্রকৃতি-পর্যায়ে আর 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি' পূজার পর্যায়ে সাজানো আছে 'গীতবিতানে', এই ব্যাপারটা লক্ষ করে বিব্রত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি'কে যে প্রেমের

কবিতাও মনে হতে পারে, এ-কথা বলতে বুদ্ধদেব দ্বিধা করেননি। কিন্তু একে প্রেমের পর্যায়ে সাজিয়ে দিলেই কি যথেষ্ট তৃপ্ত হতাম আমরা? আর 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে' : সে-ই বা কীভাবে অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিতে ক্ষান্ত থাকবে তাহলে? কেন-বা তাকেও বলা হবে না প্রেমেরই গান? যার দেখা না-পেয়ে এই বাদলবেলা কাটতে চায় না, প্রতীক্ষায় একা দুয়ারের পাশে বসিয়ে রেখেছে যে, সে কি প্রেমিক অথবা প্রেমিকাই নয়? এর কোনো কথাই নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই, এই 'তুমি' এক আশ্চর্য সর্বনাম, আক্ষরিক অর্থেই 'সর্বনাম' সে। 'নিবিয়ে দাও চোখ : আমার তবু তুমি দৃশ্য ; / বন্ধ করো কান, শুনতে পাই তবু তোমাকে / পা যদি নাও থাকে তোমার দিকে আমি চলমান' — রিল্‌কের এই কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেব বলেছিলেন যে একে 'একাধারে এক মর্ত্যমানবী ও ভগবানের উদ্দেশে রচিত বলে মেনে নিতে আমরা সানন্দে সম্মত।' ঠিক, কিন্তু আমার মনে হয় এ তার চেয়েও বেশি একটু, এ এমন এক অনতিবিভাজিত স্তর যেখানে মানবী আর ঈশ্বরের সঙ্গেই মিলে আছে আরো-এক সত্তা : আত্মসত্তা। কখন যে এই তিন মিলে গিয়ে এক হয়ে যায়, আর কখন এর একটি সঞ্চারিত হয়ে চলে আসে অন্যটিতে, তা জানে না কেউ। আর এই মহিমান্বিত অগোচরকেই আভাসে আমাদের সামনে তুলে ধরে গানের সুর।

নারীকে ভালোবাসার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মন ছড়িয়ে যায় পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায়, আর এইভাবে যে-কোনো ভালোবাসাই হয়ে ওঠে এক পরমের প্রতি আত্মনিবেদন। তাই, যখন আমরা শুনি 'তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ / ও মোর ভালোবাসার ধন,' তখন সে গান 'গীতবিতানে'র পূজাপর্যায়ে সাজানো রইল

কি রইল না, সে-খবর তুচ্ছ হয়ে যায়। যেখানেই সে থাক্, প্রেমে কি পূজায়, তার পরিণাম একই চরাচরব্যাপী বিশালতায়, বিষণ্ণতায়, দেশের কালের বাঁধনহারা একই মহাশূন্যতায়। কিশোর বয়সে মন যখন জেগে ওঠে, তখন তার যে ভালোবাসা, তার সামনে তো প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নেই কোনো, সে তো ভালোবাসাকেই ভালোবাসে। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে সেই সজীব কৈশোর, পাত্রনিরপেক্ষ সেই একাকী ভালোবাসার নির্যাস। যে এই ভালোবাসা জেনেছে সে বোঝে : 'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে'। প্রাণ পিঞ্জরে যে-ভালোবাসাকে চিরবন্দী রাখা হলো আজ, এইভাবে, সমস্ত দুঃখকে সে সুখের পোশাক পরিয়ে দিতে জানে।

ভালোবাসা আছে, আছে এই সুখের পোশাক, 'হৃদয়ে সুখের বাসা', কিন্তু হঠাৎ কোনো আঘাতে সেই পোশাক থেকে বেরিয়ে আসে দুঃখের অবয়ব। এটা ভাবা ভুল যে দুঃখকে দেখেছেন যে-পশ্চিমী দার্শনিকেরা, তাঁরা সকলেই কেবল নিরাশায় তলিয়ে দেন আমাদের। এমন-কী কীর্কেগার্ডকেও তো বলতে শুনি : 'আমার সুখহীনতার মধ্যেই ছিল আমার সুখ'। ঘোষণা করেই তিনি বলতে পারেন : 'আমার দুঃখ হলো আমার দুর্গ'। ঠিক এই দুর্গ শব্দটি হয়তো ব্যবহার করেননি রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু দেশেকালে অনেক দূরের অনেক ভিন্ন এই কবিও বলবেন, দুঃখের অভিজ্ঞতা কীভাবে অপচয় থেকে বাঁচিয়ে বড়ো করে তোলে মানুষকে। এই কথাটির সঙ্গে-সঙ্গে আমার সামনে জেগে উঠছে 'রক্তকরবী', বিশুর ম্লানোজ্জ্বল মুখখানি। নন্দিনীকে সে ভালোবেসেছিল, কিন্তু সে-কথা বলতে পারেনি কখনো। কিছু পায়নি সে, কিন্তু অল্প-কিছু পাবার লোভে মহৎ বেদনাকে হারায়নি তবু। একই সঙ্গে তার বিবাগী

আর সমর্থ, উদাস আর লিপ্ত এই চরিত্রটি আমরা দেখেছি ওই নাটকে। তার ভিতরের কোমল অশ্রুবাষ্প কখনো-কখনো দেখা দেয় নিশ্চয়ই, নন্দিনীর ব্যাকুল প্রশ্নে, 'কোথায় তুমি গেলে বলো তো' এই কৌতূহলের উত্তরে যখন সে গেয়ে ওঠে 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার'। এই গানে আবার এল তরী, আবার এল সফল মানুষের দল যারা 'পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে', আবার এ-গানে দেখা দিল এক 'দিক্-ভোলাবার পাগল', এই দুঃখ-পারাবারের ঢেউ-এর উপর যার হাসির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। যেন বিশুও, আর বিশুর মতো এই গানের সমস্ত শ্রোতাও, ভিতরে-ভিতরে কীর্কেগার্ডের মতো অনুভব করে কোথাও : আমার সুখ-হীনতার মধ্যেই ছিল আমার সুখ।

জন্ম নিতে-না নিতেই মরে যায় মুহূর্ত, পেতে-না-পেতেই হাত-ছাড়া হয়ে যায় পাওয়া। এই এক মৃত্যুগহ্বর ঘিরে আছে আমাদের সমস্ত জীবন। কিন্তু সেই মরণলোক থেকে উঠে আসে স্মৃতির পর স্মৃতি, কানাকানি হতে থাকে এ-পারে ওই-পারে। জীবনের দায় থেকে পালাই না আমরা, দু-হাত দিয়ে ধরতে চাই তার সমস্ত প্রত্যাজ, মুখে নয় কোনো গ্লানির চিহ্ন, অমলের সৌন্দর্যে ভরে যায় দশদিগন্ত, নিজেকে উদ্‌গত করে তুলতে চাই উদ্‌ভিদের মতো সজীব — কিন্তু তারই মধ্যে বুকের পিছনে ধ্বনিত হতে থাকে ক্লান্তি-হীন এক গোপন স্বর : 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার'।

এই জোয়ার থেকে জেগে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গান।

নিভৃত প্রাণের দেবতা

ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি শুনে মুগ্ধ ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে একজন স্টপফোর্ড ব্রুক। ইনি ভাবছিলেন, এই লেখা-গুলিকে প্রকাশ করতে কি রাজি হবেন কবি। প্রকাশিত হলে তেমন-কোনো আলোড়ন উঠবে না কোথাও, এ-ও মনে হয়েছিল তাঁর। এর মূল্য হবে শুধু এই যে নিভৃত মুহূর্তের সুকুমার সঙ্গী হিসেবে পাঠকের কাছে থেকে যাবে তা, ঘোষণা করে পড়বার মতো কবিতা হয়তো নয় এটা।

এ-কথা যখন ভাবছিলেন ব্রুক, নিশ্চয় কবিতা আর তার কাজ নিয়ে ভিন্ন একটা ধারণা জেগে উঠছিল তাঁর মনে। তিনি নিজেই নিশ্চয় চাইছিলেন শান্ত আর আত্মস্থ কোনো কবিতা, যা পড়ে মনে হয় যেন কোনো পাঠকের প্রত্যাশী নয় সে-লেখা। কবিতা যে আড়ি পেতে শুনে নেবার জিনিস, স্বগতকথন শুধু : যৌবনে একদিন মিলের এই ধারণার প্রতিবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু প্রৌঢ়তায় পৌঁছে এমন রচনা তাঁকে লিখতে হলো যা আড়ি পেতে শুনে নেবারই গান, যা পড়ে ব্রুকের মতো কেউ ভাবতে পারেন : এই লেখাগুলিকে প্রকাশ করতে কি রাজি হবেন কবি।

কেবল ব্রুকই যে এটা ভেবেছিলেন তা অবশ্য নয়। রচনা-গুলির আদর হবার পর রবীন্দ্রনাথই লিখলেন অজিতকুমার চক্রবর্তীকে : 'আমি নিজে কতবার মনে করেছি এবং তোমাদের

বলেছি, বাংলা ভাষাতেও এগুলো ঠিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয়—এ কেবলমাত্র আমার নিজের মনের কথা, আমারি প্রয়োজনে লেখা।' কথাটা শুনে প্রথমে একটু বিহ্বল লাগে আমাদের, আমরা বুঝতে চেষ্টা করি এর মধ্যে বিরোধটা ঠিক কোথায়। কেবলমাত্র 'নিজের মনের কথা' হলে, নিজেরই প্রয়োজনে লেখা হলে, তা কি 'সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয়' আর ? ১৩১৯ সালে লেখা এই চিঠির পরবর্তী অংশটুকু হলো, 'এখন মনে হচ্ছে কেবলমাত্র নিজের জন্যে লিখলেই সেটা যথার্থ সকলের জন্যে লেখা হয়—এবং অলংকারটা বাদ দিলেই মূল্যটা বেড়ে ওঠে।' নিজের জন্যে লিখলেই যে সকলের জন্যে লেখা হয়, এই ধারণায় পৌঁছতে তাহলে এতদিন লাগল রবীন্দ্রনাথের ? তাহলে, ভাবনার এই কোণ থেকে, তাঁর পূর্ববর্তী—অথবা পরবর্তী—রচনাগুলির বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত করব আমরা ? সেগুলি কি তবে 'যথার্থ সকলের জন্যে লেখা' ছিল না ?

এই কথাটার বিচার করতে গেলে বোঝা যাবে, কেন একদিন সমালোচকরা ভুল করে ভেবেছিলেন যে 'গীতাঞ্জলি'র পর্ব হলো কবিপ্রতিভার নির্বাসনের পর্ব। এটা ভেবে অনেকে ব্যাকুল ছিলেন যে 'খেয়া' থেকে 'বলাকা'র মধ্যবর্তী দীর্ঘ আটবছরের সময়খণ্ডে কবিতা থেকে ছুটি নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ফিরে গিয়েছিলেন নিতান্তই গানের জগতে, 'গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই এই ভুবনে' ! এই ভুল ব্যাকুলতা যে বোধ করেছিলেন এঁরা, এই সময়টাকে যে ভাবছিলেন কবিতা থেকে সরে যাওয়া, তার কারণ নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথেরই মতো তাঁদের অস্পষ্ট ওই সংশয় 'এগুলো ঠিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয়'। উলটো-সংশয়ে

সেদিন ভাবেননি এঁরা যে হয়তো-বা এ-লেখাগুলি তৈরি করছে কবিতারই এক ভিন্ন আদর্শ, গড়ে উঠছে আরেকরকমের কবিতা, যা কোনো আলোড়ন তোলে না, যা পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কোনো সংলাপ নয়, যা কেবল নিভৃত মুহূর্তের সুকুমার সঙ্গী হিসেবে থেকে যায় কারো কাছে। বাইরের দিকে মুখ নেওয়া আর ভিতরের দিকে মুখ নেওয়া এই দুই ভিন্ন স্বাদেরই যে হতে পারে কবিতা, এই সংশয় না-করে তাঁরা ভুল করেছিলেন সেদিন।

অবশ্য, এ-ভুলের দিকে তাঁদের পৌঁছে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথই নিজে। এই রচনাগুলি যে তাঁর কবিতার ধারায় গণ্য নয়, এগুলি যে গান মাত্র, সে-কথাটাকে বড়ো বেশি করে চিহ্নিত করা হয়েছিল তখন, এর নামে, এর বিবরণে। 'অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া, তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্র বাহির করা হইল' এই ভূমিকা নিয়ে ছাপা হলো 'গীতাঞ্জলি'। পাঠক মনে করতেই পারেন যে 'গানের বহি' বা 'গান'-এর মতোই এ হলো তাঁর আরেকখানি গীতি-সংকলন, কবিতার ইতিহাসে অনেকটা উড়ে-আসা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেক গানের বইয়ের সঙ্গে এ-বইয়ের (অথবা, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি এই ত্রয়ীর) একটা মৌলিক প্রভেদ লক্ষ করা চাই। অনেকদিনের সঞ্চিত কিছু গান নিয়ে এ কোনো সংকলন মাত্র নয়, এর আছে সামগ্রিক এক নিজস্ব গড়ন। আর সেই গড়নকে আমরা দেখতে পাব তাঁর কবিতারই এক বিশেষ পরীক্ষা হিসেবে, সেই পরীক্ষা, কবিতা যেখানে তার সমস্ত অলংকার ছেড়ে দিয়ে গানের তুল্য হয়ে দাঁড়ায় : নিবিড়, সরল, বেদনাময়।

কেবলই গানের কথা ভাবলে এত করে বলতে হতো না 'আমারই প্রয়োজনে লেখা—নিতান্তই নিরলংকার' অথবা 'অলংকারটা বাদ দিলেই মূল্যটা বেড়ে ওঠে'। আভরণবর্জনের এই যে আবেগ, তার বিখ্যাত পরিচয় 'গীতাঞ্জলি'র পাঠকমাত্রেই মনে করতে পারবেন : 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার'।

এখানে, এই 'গান' শব্দটি, ঠিক চলিত অর্থে যাকে আমরা সুরে-বসানো-কথা বলে জানি, তা নয় আর। এই 'গান' এখানে কবিতারই অন্য এক নাম, তাঁর শিল্পেরই অন্য এক নাম। মনে রাখা ভালো যে অত্যুক্ত এই লাইনটি কিন্তু সুরহীন এক রচনা থেকেই নেওয়া, যেমন রচনা আরো অনেক আছে 'গীতাঞ্জলি'তে। 'গীতাঞ্জলি'র ঠিক ক'টি রচনায় সুর আছে—অথবা অন্য ভাষায় বলা যায়—'গীতাঞ্জলি'র ঠিক ক'টি রচনা 'গীতবিতানে' গৃহীত হবার উপযুক্ত, সে-বিষয়ে আমরা কি সচেতন থাকি সব সময়ে ? 'হে মোর চিত্ত' আর 'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে' লেখাদুটিকে অন্তর্গত করে ভাবলেও সে-সংখ্যা পঁচাশি মাত্র, বাকি বাহাত্তরটি রচনাকে এখনো আমরা রবীন্দ্রনাথের সুরের মধ্য দিয়ে জানতে পারিনি। 'গীতাঞ্জলি' বলতে কি তবে আমরা ওই অর্ধেকটাকেই বুঝেছি এতদিন ? 'গীতাঞ্জলি' কি 'গীতবিতানে'রই একটি টুকরো মাত্র ? না তার চেয়ে বেশি কিছু, ভিন্ন কিছু ? 'আকাশতলে উঠল ফুটে আলোর শতদল' তো কবিতাই, দিক্-দিগন্তরে ছড়ানো সেই শতদলের পাপড়িগুলিকে ছেড়ে দিলে 'গীতাঞ্জলি'র অনেকটাই যে মুছে যায়, সে-কথাও আমাদের মনে রাখা ভালো। আর সেইটে মনে রাখলেই বোঝা যায় যে এ-বইটিতে কবি এসে পৌঁছলেন বাংলা কবিতার বিরলতম এক মুহূর্তে, যেখানে সনাতন গীতিসাহিত্য

আর অধুনাতন কাব্যসাহিত্য একটা বিন্দুতে এসে মিলেছে, ঐতিহ্য যেখানে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে নবীন এক আধুনিকতায়। এর সব রচনায় সুর নেই, কিন্তু যে-কোনো রচনাই সুরে বাহিত হবার যোগ্য, কবিতা এখানে তার সমস্ত মেদ ঝরিয়ে দিয়ে ছুঁয়ে আছে শুধু সারাৎসার, আর তাই তাকে দেখতে পাই কবিতার এক নতুন আদর্শে। রাত্রি এসে যেখানে দিনের পারাবারে মেশে, সেই মোহনার ধারে কারো সঙ্গে দেখা হলো বলে জানিয়েছিলেন কবি। তাঁর শিল্পরূপও এখানে এসে মিলেছে তেমনি এক মোহনায়, কবিতা এসে যেখানে মিশে যায় গানের সমুদ্রে।

গানই ছিল একদিন আমাদের কবিতা। কিন্তু আধুনিক যুগে পৌঁছে—গত শতাব্দীর আধুনিকতায়—দুই ভিন্ন ধারা হলো গানের আর কবিতার। ভিন্ন হলো, তবু এই শতাব্দীর আধুনিকতার আগে পর্যন্ত, আমাদের প্রধান কবিরাই ছিলেন সুরের জগতের মানুষ: রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত বা নজরুলের মতো কবিরা। কিন্তু নজরুল থেকেই একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল এই যোগ, তৈরি হলো গানমুক্ত কবিতার দেশ।

এই ইতিহাসে, রবীন্দ্রনাথের হাতে অনেক সময়েই গান আর কবিতা এগিয়ে এসেছে দুই ভিন্ন শিল্পরূপ হিসেবে, দুয়ের মধ্যে একটা আলগা যোগ মাত্র ছিল। তখন, কবিতা যেন ছিল তাঁর বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলবার মতো, আবেগের প্রস্রবণ। স্বরের একটা আপেক্ষিক উচ্চতা ছিল তখন, শুনিয়ে দিতে সাহস নেই বলেও আপন কথা তখন তিনি শোনাতে পারতেন পাঠককে। আর ঠিক সেই সময়েই, গান ছিল তাঁর ভিতর দিকের ক্ষরণ, যেন আবহময় মন্ত্র কোনো। ফলে, অনেক সময়েই দেখা যাবে গানে

আর কবিতায় দুই ভিন্ন স্বর ফুটে উঠছে একই কালের, এমন-কী একই দিনের, রচনায়। কবিতায় যখন বলতে পারেন 'এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি', গানে তার পরের দিনই বলেন 'আমার নাই-বা হলো পারে যাওয়া'! কবিতায় যখন বলতে পারেন 'রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে বাজিয়ে আপন তূর্য', গানে সে-দিনই সরে আসতে পারেন 'আমরা' থেকে 'আমি'তে, চাইতে পারেন 'অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো'। কবিতায় যে-দিন লেখা হতে পারে 'এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো', যে-দিন ডাক দেওয়া হয় 'রক্তবাসে আয় রে সেজে', ঠিক সেইদিনই দেখি সম্ভব হয় এই গান 'এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে'। কবিতায় যখন বলা যাচ্ছিল 'ঢাকিস নে মুখ ভয়ে ভয়ে', গানে তখন এই বেদনা 'ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে / দিনশেষে এল তোমারি আলয়ে'। কবিতার ওই 'সর্বনাশে'র সঙ্গে গানের এই 'মহারাজা'র, অথবা কবিতার ওই 'রুদ্রে'র সঙ্গে গানের এই 'অতল কালো'র একটা অন্তঃসংগতি শেষ অবধি তৈরি হয় সত্যি, সন্দেহ নেই যে একই সত্যের এই দুই প্রকাশ, কিন্তু তবু এখানে আমরা দেখি দুয়ের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে ঈষৎ দূরতা, কিছু-বা ছিন্নতা, অন্তত এক আপাত-বিরোধ।

'গীতাঞ্জলি'র রচনা হলো সেই রচনা যেখানে অল্প সময়ের জন্য এই বিরোধ গেছে লুপ্ত হয়ে, গান আর কবিতা যেখানে ভিন্ন দুই শিল্পরূপ নয় আর, যেখানে তা হয়ে উঠছে সামঞ্জস্যময় সুষমাময় অচ্ছিন্ন এক অবয়ব। 'গীতাঞ্জলি'র আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কবির আর গীতিকারের যে দুই সমান্তরাল টান চলছিল, যে ভিন্ন দুই স্রোত চলছিল কবিতার আর গানের, পরেও যা ভিন্ন স্রোতে চলবে

আবার, এইখানে এসে যে তা মিলে গেল একবার, এইটেই এ-কাব্যের মস্ত এক পরিচয়। ব্যাপ্তির চেয়ে গভীরতার চাপ এখানে বড়ো, পরিধির চেয়ে কেন্দ্রের। আর, কবিতা যখন সেই কেন্দ্রকেই ছুঁতে চায়, তখন সে হয়ে আসে কথাবিরল সাজবিহীন, তখন তাকে মনে হতে পারে যেন সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয় আর, তখন তার যেটুকু ভার থাকে সে শুধু রসের ভার। 'ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত' তার সেই নিবিড় আয়তন দেখে রোটেনস্টাইনের মতো কারো মনে হতে পারে: 'অল্প লোকই আছেন যাঁরা তোমার মতো সহজে থামতে জানেন।' শুধু গান নয়, 'গীতাঞ্জলি' সেই সহজে থেমে যাওয়ার কবিতা।

সপ্তলোকের নীরবতা

মহাভারতের ২১৪৭৭৮টি পদের তুলনায়, রামায়ণের ৪৮০০০ পদের তুলনায়, 'গীতাঞ্জলি'র এই থেমে যাওয়া ছোটো আয়তন দেখে তৃপ্ত নিশ্বাস নিয়েছিলেন আঁদ্রে জিদ। এর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন আলোর নানা স্তর, এর মধ্যে তিনি শুনেছিলেন শুমান বা বাখ্-এর সংগীতের তুল্য কোনো ধ্বনি। কেবল জিদ নন, প্রতীকবাদের কিছু-মাত্র ছায়া যাঁদের ছুঁয়েছিল কখনো, তাঁদের সকলেরই কাছে মোহময় ছিল শিল্পের বলয়ে এই সাংগীতিক আবহ। জিদ তাঁর উপন্যাসের নায়ককে দিয়ে বলিয়েছিলেন একবার যে উপন্যাসেরও কোনো 'বিষয়' নেই, উপন্যাসও সরিয়ে নিতে চায় সমস্ত ঘটনা, উত্তেজনা, চরিত্রের আবর্তন। এ-সব তো, মনে হয়েছিল তাঁর, কেবল চলচ্চিত্রেরই যোগ্য উপাদান। এইসব ঝরিয়ে নিতে-নিতে উপন্যাসেরও এক শুদ্ধ রূপ খুঁজতে চেয়েছিলেন যিনি, তাঁকে যে মুগ্ধ করবে

গীতাঞ্জলি' বা 'ডাকঘর' তা বুঝে নেওয়া যায়, বোঝা যায় কেন তিনি এই রচনাগুলিকে অনুবাদ করবার জন্ত উন্মুখ হবেন একদিন।

ইয়োরোপের প্রতীকবাদী কবিরা পেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন রোম্যান্টিকদের কলরোলময় উত্থানের ধরন, তাঁদের আত্মবিহ্বলতা। আত্মস্থভাবে তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন যেন কোনো মন্দিরের অলৌকিক এক পর্দার কেঁপে ওঠা – trembling of the veil – যা থেকে ছুঁতে পারা যায় গভীরতম বাস্তবকে। যবনিকা কম্পমান : মালার্মে থেকে যে-শব্দবন্ধ গড়িয়ে এসেছিল ইয়েট্সের আত্মজীবনীতে (আমাদের মনে পড়বে, একটু ভিন্ন কাজে বুদ্ধদেব বসুও একে ব্যবহারে এনেছিলেন তাঁর 'তিথিডোর' উপন্যাসে) : সেই যবনিকার অনেকটা প্রত্যন্তে এসে দাঁড়িয়েছে 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা। ইয়োরোপে নতুন কবিরা পুরোনো কবিদের অস্বীকার করবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, কবিতার এক তল থেকে ভিন্ন এক তলে পৌঁছবার সাধনা করছিলেন তাঁরা। আর বাংলাদেশে আমরা একই কবির মধ্যে পাই এই দুই তলের চিহ্ন, নিজেকেই তিনি অস্বীকার করে এগিয়ে এসেছিলেন 'চিত্রা' থেকে 'গীতাঞ্জলি'র দিকে, রোম্যান্টিক বিশ্ব থেকে প্রতীকীদের জগতে। দোলাচলে আবার তিনি ফিরে যাবেন বটে অন্ত দিকে, কিন্তু অল্প সময়ের এই 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে তাঁর যে-মূর্তি আমরা দেখতে পাই তার সঙ্গে প্রতীকবাদের ভাষা-সমস্যার সহজ একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

পরমকে স্পর্শ করবার যোগ্য পরম ভাষা কোথায়? কখনো-কখনো মনে হয়েছিল নীরবতাই সে-ভাষা। বাক্য যেন সত্যের দিকে এগিয়ে যাবার এক বাণিজ্যিক পদ্ধতি মাত্র, সে যেন শুধু বেচাকেনার বাজার। তখন এই বাজার থেকে, শব্দের এই স্তূপ

থেকে সরে যেতে চান কবি এমন এক দেশে, যেখানে ভাষা থেকে বেরিয়ে আসে তার অন্তরতর সুর।

এই কথাগুলি থেকে পাওয়া যাবে মালার্মের প্রতিধ্বনি। কিন্তু শুধু কি মালার্মেরই? এ কি রবীন্দ্রনাথেরও কথা হতে পারত না? সেই রবীন্দ্রনাথ, যিনি মুখর কবিকে নীরব করে দেবার আহ্বান জানাচ্ছিলেন তাঁর দেবতার কাছে? নানা কথা জমে উঠলে যিনি আক্ষেপ করছিলেন 'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন', সেই রবীন্দ্রনাথকেই কি দেখছি না এখানে? মালার্মে বা প্রতীকবাদীরা যেভাবে শব্দের ব্যবহার করতে চাইতেন, যেভাবে ধ্বনিত করতে চাইতেন শব্দমধ্যগত নীরবতার সুর, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক মিল হবে না বটে—কিন্তু তবু রোম্যাণ্টিক ভাবাবিলাস থেকে সরে আসার আবেগ যে 'গীতাঞ্জলি'র কবির কতটাই ছিল, কবিতার মধ্যে 'নীরব' শব্দটির নিরন্তর আবর্তনেও তার একটা বাইরের পরিচয় ধরা পড়ে। এখানে তাঁর বীণা নীরব, বাণী নীরব, নীরব রবিশশী, রাত্রি অন্ধকার আকাশ হৃদয় বা সপ্তলোক, সবই কেবল নীরবতায় ভরা।

আজ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতা পড়ে নেবার পর, সকলেই জানেন যে বাণীবিরল এমন কবিতাশরীরের নীরব দেশে কবিকে পৌঁছতে হলো দু-বার। একবার এই 'গীতাঞ্জলি'র সময়ে, আর-একবার তাঁর শেষ বছরের রচনায়, তাঁর শেষ চতুষ্কে। একটা সাদৃশ্য আছে এই দুই মুহূর্তের, যদিও ভিন্নতাও আছে কিছু। 'গীতাঞ্জলি'র এই পর্বে তিনি পৌঁছেছিলেন যেন স্বভাবতই, তাঁর সত্তার ভিতরকার স্রোতেই যেন-বা। শেষ চতুষ্কে তাঁকে এই গড়ন তৈরি করতে হয়েছিল সচেতন আয়োজনে, শিল্পীর পরিশ্রমে। 'গীতাঞ্জলি'তে এই বাহুল্য-ঝরানো রূপ তাঁকে অনায়াসে এগিয়ে নিয়েছিল সুরের

দিকে, আর শেষ চতুকে তিনি ভাস্করের মতো কুঁদে তুলছিলেন তাঁর অভিপ্রেত অবয়ব, ছেনিতে বাটালিতে যেন স্পষ্ট করে তুলছিলেন কবিতার চারপাশের রেখাগুলিকে। একটা জগৎ সুরে বাহিত, আরেকটা জগৎ ভাস্কর্যে কঠিন। কিন্তু এই দুই জগৎই আমাদের সামনে এনে দিচ্ছে এক স্বচ্ছতা আর সরলতার আদর্শ।

একটা কি কারণ ছিল না এই সরলতার? 'এ কেবলমাত্র আমার নিজের মনের কথা, আমারি প্রয়োজনে লেখা': কবিতা যখন এই বোধে এসে দাঁড়ায়, আভরণহীনতা তখন তার পক্ষে সহজ। কিন্তু কখন কবি ভাবতে পারেন যে তিনি বলছেন কেবলই তাঁর নিজের মনের কথা? দেশের জন্য ভালোবাসা, সুখদুঃখময় বিপুল মানববিশ্বের ঘাতপ্রতিঘাত অথবা ব্যক্তিগত প্রেমের বেদনা, এর সবই তো এক হিসেবে নিজের কথা। নিজেরই তো কথা আছে 'মানসী'তে বা 'বলাকা'য় বা 'পত্রপুটে'। কিন্তু না, এখানেও নয়, কবি যখন নিগূঢ়তমভাবে নিজের কথা বলেন তখন তিনি পৌঁছন তাঁর আত্মার প্রশ্নে, সত্তার সঙ্গে মুখোমুখি হবার ভাবনায়। একেবারে ভিতর দিকে ঘুরে যায় তখন লেখা, তাকে তখন মনে হয় যেন 'আমারি প্রয়োজনে' এই রচনা।

পঞ্চাশ বছর বয়সে আর আশি বছর বয়সে, এই দু-বার কবি বিভোরভাবে পৌঁছেছিলেন এই আত্মিকের কেন্দ্রে, তার মীমাংসায়। বাইরের অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে একেবারে ঠেলে ফেলে নয়, তাকে অন্তরঙ্গ করে ধরে রেখেই কবি তখন খুঁজছিলেন এর নির্যাস, জানছিলেন সত্তাপরিচয়। আর এরই আবেগে, এই দুই ভিন্ন সময়ে, ঈষৎ ভিন্ন পদ্ধতিতে, তাঁর কবিতার শরীর হয়ে এল সরল, গহন, ঐক্যময়—যা দেখে একদিন 'এথিনিয়মে'র সমালোচকের মনে হয়েছিল এরা

পরম্পরায় কয়েকটি শিশিরবিন্দু যেন, পাউণ্ড যা দেখে ভাবতে পেরেছিলেন দূরের আকাশে কোনো নক্ষত্রমণ্ডল।

নিভৃত প্রাণের দেবতা

এই যে নির্যাসের কথা বলা হলো, তারই নাম কি তবে ঈশ্বর? রবীন্দ্রনাথের ভগবান?

কোনো আলোড়ন হবে না এ নিয়ে, রুকের এই ধারণা সত্ত্বেও 'গীতাঞ্জলি'-সূত্রে বিদেশী চঞ্চলতার প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে তখন। পিয়ার্সনের কথা তুলে অজিতকুমার চক্রবর্তী একটি চিঠিতে লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে: 'যে ঘাটে বসে আপনি গীতাঞ্জলি লিখেছেন সেই ঘাটের ধারে এসে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন [পিয়ার্সন]— চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।' এই হলো আমাদের একটি প্রত্যাশিত ছবি, ভক্তের এই নিবিষ্ট আত্মনিবেদন। যে-গানটি বারবার তখন শুনতে চাইছিলেন পিয়ার্সন, তা হলো 'জীবনে যত পূজা হলো না সারা জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।' শান্তিনিকেতনের অনুরাগীদের তিনি বলছিলেন তখন, সেই প্রথম মুহূর্তে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের কত বেশি দরকার, 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে তাঁরা পেয়ে গেছেন তাঁদের কতখানি জীবনব্যাপী নির্ভর।

এই পাওয়ার মধ্যে, সন্দেহ নেই, এঁদের ঈশ্বরকেই দেখেছিলেন এঁরা। একটি কবিতায় লিখেছিলেন অ্যাণ্ড্রুজ: অন্তরতর মন্দিরঘরে প্রভু আর ঈশ্বরের মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি হও, জেনে নাও কী-ভাবে বিশ্বে তাঁর ভালোবাসার ধারা বয়ে যায়। 'গীতাঞ্জলি' তাঁর সেই মন্দির। আমাদের প্রচণ্ড উৎক্ষিপ্ত সমকালীন পৃথিবীর পক্ষে এ নিশ্চয় একেবারে বিপরীত এক অধ্যাত্মজগৎ, যেমন বলেছিলেন

ইয়েট্‌স্‌, তাঁর ভূমিকায়। আর এই বলা থেকেই যেন সুর বাঁধা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। 'গীতাঞ্জলি'র তুলনাসূত্রে ইয়োরোপে অনেককেই সেদিন ভাবতে দেখি, ইয়েট্‌সের ধরনে, টমাস আ কেম্পিস্‌ বা সেন্ট ফ্রান্সিস্‌ অব আসিসি বা অন্তত পক্ষে ব্লেকের প্রসঙ্গ। মিস্টিসিজ্‌ম্‌ বিষয়ে অভিজ্ঞ ইভ্‌লিন আণ্ডারহিলের মনে হয়েছিল জালালুদ্দীন রুমির কথা, সেন্ট জন অব দি ক্রস বা সেন্ট অগাস্টিনের নাম : 'গীতাঞ্জলি'র কবিতায় তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন মরমিয়াদের পরমা সিদ্ধি।

স্বাভাবিকই ছিল সেটা। আমরা অনেকদিন পর্যন্ত একে ভেবেছি কেবল উপাসনার গান, একে মিলিয়ে পড়েছি তাঁর 'শান্তি-নিকেতন' প্রবন্ধাবলী আর 'সাধনা' বক্তৃতাবলীর সঙ্গে। যে-গানের পদে-পদে চলে আসে প্রভু বা নাথ বা পরানসখার মতো শব্দ, যেখানে আকাঙ্ক্ষা কেবল সর্বাত্মময় কোনো মহাসত্তার মিলনলাভ, যেখানে সনাতন উচ্চারণে বারেবারেই উঠে আসে এইসব প্রার্থনা বা ক্রন্দন : 'তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ' 'সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ' বা 'অন্তরে আছ হে অন্তর্যামী'র মতো অজস্র লাইন — সেখানে এ-গানগুলিকে আমাদের অনেকদিনের ধর্মীয় ধারার সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া অসম্ভবও নয়, অসংগতও নয়। ধর্ম আর কবিতা যেখানে এক জায়গায় এসে মিশেছে আমাদের দেশে, 'গীতাঞ্জলি' সেই চিরাগত ঐতিহ্যের কবিতা, এক হিসেবে সেটা সত্যি কথা।

কিন্তু তখন একটা অন্য প্রশ্ন ওঠে, যে-প্রশ্ন তুলেছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, কিছুদিন আগে। তা-ই যদি হবে, যদি এক অধ্যাত্ম ধর্মীয় মণ্ডলের মধ্যেই ঘেরা থাকবে এই রচনাগুলি, যদি একে আস্বাদন করা যায় রজনীকান্ত বা অতুলপ্রসাদের গানের মতোই,

তাহলে আধুনিক শ্রোতার কাছে এর কোনো আবেদন কি থাকে আর? যে আধুনিক শ্রোতা, ধরা যাক, ধর্মে বা ঈশ্বরে কোনো বিশ্বাস রাখেননি? যেমন করে আমাদের মন থেকে সরে যায় অন্য অনেক আধ্যাত্মিক ভক্তিগান, 'গীতাঞ্জলি'র লেখাগুলিও কি তেমনি করে চলে যায় দূরে? যিনি ধর্মের স্বাদে পড়েন বা শোনেন এই গানগুলি, তাঁর কোনো সমস্যা নেই। যিনি ধর্মের বা ঈশ্বরের প্রতি অনাগ্রহে প্রত্যাখ্যান করেন এ-বই, তাঁরও নেই কোনো সমস্যা। কিন্তু ভাবতে হয় তাঁকে, সেই আধুনিককে, যিনি নিরীশ্বর, তবু যাঁকে আবিষ্ট করে 'গীতাঞ্জলি'। যেমন আইয়ুব, যেমন বুদ্ধদেব। অথবা যেমন ১৯১৩ সালের (১৫ মে) 'দি নেশন' পত্রিকার 'গীতাঞ্জলি'-সমালোচক, যিনি রোটেনস্টাইনের ড্রইংরুমকে পবিত্র মন্দির বানাবার বিরোধী ছিলেন, 'গীতাঞ্জলি'তে কোনো প্রাচীন হিন্দু মরমিয়াকে খুঁজে পাননি যিনি, যিনি এর মধ্যে দেখেছিলেন কেবল এক true flower of the autumn of romance, with hints of everlasting faith!

আইয়ুব বলেছিলেন, এর সেই গানগুলিই তাঁকে স্পর্শ করে যার মধ্যে আছে প্রেমের বেদনা বা প্রকৃতির টান। কিন্তু শুধু 'গীতাঞ্জলি' বইটিকে যদি গণ্য করা যায় তো এমন রচনা খুব বেশি মিলবে না। মেঘের পরে মেঘ জমে উঠলে সে-আঁধারে যিনি প্রতীক্ষা করে থাকেন আর যাঁর প্রতীক্ষা করা হয়, তাঁদের হয়তো মানবিক প্রণয়সম্পর্কেই কল্পনা করা সম্ভব। প্রেমের গান হিসেবেই গাওয়া সম্ভব 'আর নাই রে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে'। প্রকৃতিরই গান নিশ্চয় 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে'। তবু, এ-রকম দু-চারটি রচনাই এ-বইয়ের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় নয়। এটা

মানতেই হবে যে 'গীতাঞ্জলি'র ভুবন প্রভুময় ভুবন, ঐশ্বরিক বোধ তার আদ্যন্ত ছড়ানো। বুদ্ধদেব একে বলেছেন অপেক্ষার কাব্য, কোনো এক পরম মিলনের জন্য চিরপ্রতীক্ষায় কেটে যায় এর কবিতাগুলি, সেই পরমতার প্রকৃতি অস্বীকার করে 'গীতাঞ্জলি' পড়া শক্ত।

কিন্তু তার জন্য কি পাঠক বা শ্রোতার দিক থেকে ধর্মীয়তার দরকার আছে কোনো? যে-কোনো মানুষই কি নিজের মুখোমুখি হলে শুনতে পায় না আরেকটা পাখার ঝাপট, যার কথা অজিত-কুমারকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? 'আমার মধ্যে এমন আমি আছে যে আমার চেয়ে ঢের বড়ো, আমার মধ্যে তাকে কুলোবে কী করে', এই কথা যখন লেখেন রবীন্দ্রনাথ, তখন সেই অকুলোন মূর্তিকে ঈশ্বর নাম দিতে পারেন কেউ, কেউ-বা না-ও দিতে পারেন। এইটে কেবল সত্যি যে ধর্মীয়তার বাইরে এই সত্তার অনুভব ভাবুক মানুষমাত্রেরই অনিবার্য অনুভব, তার প্রেম বা প্রকৃতি বা অন্য যে-কোনো বোধেই জড়িয়ে থাকে তা। এইটে ভেবেই মংপুতে বসে মৈত্রেয়ী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অনেকদিন পরে: 'আমি কোনো দেবতা সৃষ্টি করে প্রার্থনা করতে পারিনে, নিজের কাছ থেকে নিজের যে মুক্তি সেই দুর্লভ মুক্তির জন্য চেষ্টা করি। সে চেষ্টা প্রত্যহ করতে হয়, তা না হলে আবিল হয়ে ওঠে দিন।'

> 'কে ওখানে?
> আমি।
> আমি কে?
> তুমি।
> আর সেই হলো জাগরণ—তুমি আর আমি।'

অডেন উল্লেখ করেছিলেন ভালেরির এই রচনাংশ, আর এর নজিরে বলেছিলেন তিনি : ঈশ্বরের সঙ্গে এই আমি-তুমির সম্পর্কে পৌঁছতে পারে মানুষ, পারে তার প্রতিবেশীর সঙ্গেও, কেননা তার নিজের সঙ্গেই নিজের আছে এই আমি-তুমির টান। নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হবার এই একটা পথ আছে বলেই 'গীতাঞ্জলি'র আস্তিকতাও আমাদের তার মুঠোয় ধরতে পারে। ঈশ্বরের অর্থে নয়, 'আমি'র অর্থে-ই। অনেক সময়েই আমরা এই সম্পর্কের কেন্দ্রের দিকে পৌঁছতে চাই না, ঘুরে বেড়াই শুধু পরিধির জৌলুশে, আর সেইজন্তে — কীর্কেগার্ড তাঁর ডায়েরিতে যেমন লিখেছিলেন — বেশিরভাগ মানুষের আমিই হলো এক ভাঙাছেঁড়া আমি, গ্লানিময় এক 'টুকরো-আমি'।

প্রতিদিনের ছোটো-ছোটো সেই গ্লানির মধ্যে ঘুরে বেড়াই, ক্লীব হয়ে আসে মন, মনে হয় যেন 'সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা', নিজেকে ঘিরে-ঘিরে ঘুরবার ক্লান্তিতে ছেয়ে যাই, যখন জানি যে 'সত্য মুদে আছে' আমাদেরই দ্বিধার মাঝখানে, তখনই একবার আত্মকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছে হয় জগতের আনন্দযজ্ঞে, তখন আমাদের সবারই মনে হয় 'আমার আমি ধুয়ে মুছে তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে'। ভালেরি তখন লিখতে পারেন 'সেই হলো জাগরণ' আর 'গীতাঞ্জলি'র কবি বলতে পারেন 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ'। কিসের দিকে এই জেগে ওঠা ? হয়ে-ওঠার মুক্তিতে। মানুষ তখন হতে চায় শুধু আপন সমগ্রতার অভিমুখী, যে-সমগ্রতায় বাইরের পৃথিবীকেও তার চাই। হয়ে-ওঠার এই আগুন যাকে ছুঁয়ে যায় একবার, তাকে পৌঁছতেই হয় 'আমি'র দিকে, অর্থাৎ 'তুমি'র দিকে, অথবা 'আমি-তুমি'র মিলন-মুহূর্তের

দিকে। তখন, একদিকে যেমন এই টানাপোড়েনের বেদনা আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে অভিজ্ঞতার এই অমৃত হলো বস্তুত এক 'আগুনভরা সুধা', অন্যদিকে তেমনি দেখিয়ে দেয় কীভাবে ব্যক্তিগত বিপুল শোকের আচ্ছাদনে দাঁড়িয়েও কেউ বলতে পারেন 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে' প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে নিখিল পৃথিবী। শমীর মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যেই কার শক্তিতে কবি লিখতে পেরেছিলেন 'তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া'? তিনি ধর্মীয় কোনো ঈশ্বর না-ও হতে পারেন কারো কাছে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেন সকলেরই নিভৃত প্রাণের কোনো দেবতা, আত্ম-শক্তি যেন সকলের। প্রাণের লক্ষ্যে কোনো দেবতা নন, প্রাণই এখানে দেবতা, সেটা মনে রাখা চাই। সেই দেবতাকে পাবার জন্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো কথা ওঠে না আর, কথা ওঠে শুধু অন্তর্মুখিতার, আত্মদীক্ষার, সমস্যা সেখানে কেবল ধ্যান আর ধ্যানহীনতার।

বিদায় নেবার প্রায় একইরকমের দুটি গান আমরা শুনতে পাব দুখানি বইতে, একটি 'গীতাঞ্জলি'র আর অন্যটি 'গীতিমাল্যে'র। সে-দুটি গান, 'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই' আর 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই' যেন একইরকম বেদনার সুরে গাঁথা, যে-বেদনার মধ্যে জেগে আছে এক ধন্যতারও বোধ, কৃতজ্ঞতার আভা। কিন্তু, একেবারে একইরকমের কি? এত কাছাকাছি এ-দুটি গানের মধ্যে খুব-একটা স্বাতন্ত্র্যও কি নেই? 'গীতাঞ্জলি'র গানটির মধ্যে বড়ো হয়ে উঠছে এক জ্যোতিঃসমুদ্র, শতদল পদ্ম সেখানে মেলে দিচ্ছে তার দলগুলি, সেখানে যে-বিদায়ের কথা তা যেন কোনো ব্যাপ্ত প্রকৃতি থেকে চলে যাওয়া, সৌন্দর্যময় বিশ্বভুবনের পটখানিই সেখানে ছড়িয়ে আছে আমাদের সামনে। আর 'গীতিমাল্যে'র গানে, ক্রিয়াপদ যেখানে পালটে গেল দু-বছরের ব্যবধানে, যে-ছুটি পাবার কথা ছিল তা যখন পাওয়া হলো আজ, 'লেট ইট কাম' থেকে 'এ সামন্‌স্‌ হ্যাজ কাম' হলো যেখানে, সেখানে বিদায় নেবার আয়োজন যেন অনেক আপনজনের কাছে, বিশ্বপট এসে দাঁড়ায় এবার চেনা ঘরের পাশে। একটিতে ছিল আকাশের দিকে মুখ, অন্যটিতে যেন মাটির দিকে। একটিতে ছিল প্রসাদ, অন্যটিতে বিষাদ। একটি জেগে উঠছে যেন 'শারদোৎসব' নাটক থেকে, আর অন্যটি যেন 'ডাকঘরে'র গান।

'গীতিমাল্যে'র আগে লেখা হয়ে গেছে 'ডাকঘর', যে-'ডাকঘরে'

আছে সুন্দরের আবাহন। আর 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলির সমকালে লেখা হয়েছিল 'শারদোৎসব', যে-নাটকেরও লক্ষ্য ছিল সুন্দর। অথচ কতই-না প্রভেদ এ দুই সুন্দরের! উপনন্দ আর সন্ন্যাসীর প্রকৃতিদর্শনের চেয়ে কত ভিন্ন হয়ে যায় অমল আর ফকিরের জীবন-দেখা। সন্ন্যাসী বলেছিল যে ছেলেদের গানের সুর একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁছল, অনেক দূরে যেন খুলে গেল শারদার দুয়ার, 'জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে।' কিন্তু কাকে বলে এই প্রথমতম শিখর? কাকে বলে সকল আরম্ভের প্রান্ত? জীবনযাপনের কোনো প্রাত্যহিক ছবির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না বলে 'শারদোৎসব' হয়ে থাকে কেবল স্তব, কেবল সাধনার বিষয় মাত্র, সে নির্ভর নয় তেমন কোনো রূপের। অমলেরও মন চলে যেতে চায় সেই অনেক দূরের সকল আরম্ভের প্রান্তে, কিন্তু সে দেখতে পায় জীবনেরই ছবি, যে-ছবিতে বাঁহাতে লণ্ঠন আর কাঁধে চিঠির থলি নিয়ে কে একজন নেমে আসছে সেই শিখর থেকে, চলে আসছে নদীপ্রান্তর পেরিয়ে দিনরাত। এই দেখার সঙ্গে-সঙ্গে বড়ো হয়ে ওঠে অমলের চারদিকে দিনযাপনের সুখ, তাকে ঘিরে থাকে তার কাঠবেড়ালি আর পাখি, তার দইওয়ালা আর প্রহরী, অন্ধ খোঁড়া ছিদাম আর মালিনীর মেয়ে সুধা। 'শারদোৎসবে'র চেয়ে 'ডাকঘর' তাই হয়ে ওঠে অনেক বেশি জীবনমুখী।

জীবনমুখী, যদিও মৃত্যুরই ছায়া মাখানো। 'শারদোৎসবে' আনন্দ আছে, সুন্দর আছে, আছে দুঃখেরও সাধনার কথা, কিন্তু মৃত্যুর এই মাত্রাটি সেখানে লাগেনি বলে সে তত আবিষ্ট করে ধরে না আমাদের। 'ডাকঘরে'র অমলকে ঘিরে আছে মৃত্যুর এক আচ্ছাদন,

কিন্তু এই আচ্ছাদনেরই ফলে চাপা মেঘের দ্যুতির মতো মায়াময় হয়ে উঠছে সব বস্তুপরিবেশ, আনন্দ বা সুন্দর এসে দাঁড়াচ্ছে আমাদের সামনে এক বিষাদমথিত মহিমা নিয়ে। 'ডাকঘর' লেখার অল্প কিছুদিন পরে, 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই' গানটি লেখার ঠিক আগে, রোগশয্যা থেকে উঠে এসে লিখেছিলেন : 'এই আজ আমি যাহা দেখিতেছি এ যে মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের ছবি ; যেখানে বৃহৎ, যেখানে বিরাম, যেখানে বিশুদ্ধ পূর্ণতা, তাহারই উপর দেখিতেছি এই সুন্দরী চঞ্চলতার অবিরাম নূপুরনিক্কণ, তাহার নানা-রঙের আঁচলখানির এই উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণ্যগতি।' এই আঁচলেরই এপারে-ওপারে 'ডাকঘর' আর 'গীতিমাল্য', বিষাদে-আনন্দে এ তাই অনেক বেশি আচ্ছন্ন করে ধরে আমাদের, অনেক বেশি কবিতার মধ্যে নিবিড় হয়ে আসে এ দুটি বই।

অজিতকুমার চক্রবর্তী অবশ্য বলেছিলেন যে 'গীতিমাল্য' বইটিতে বেদনার কোনো মেঘমলিনমা নেই, 'গীতাঞ্জলি'র তুলনায় সেখানে মিলবে কেবল 'আনন্দের জ্যোতির্ময় উচ্ছ্বাস।' সেটা কি ঠিক ? 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ' বা এইরকম আরো দু-একটি গান হয়তো অজিতকুমারের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সন্দেহ নেই যে আনন্দ কথাটি অনেক সময়ে ভেসে আসে 'গীতি-মাল্যে'রও গানে, এখানেও কবিকে বলতে হবে যে 'আনন্দ ভাণ্ডারের থেকে দূত যে তোরে গেল ডেকে' বা 'তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে' কিংবা 'তুমি আমার আনন্দ'। কিন্তু দিগন্তের কোলে-কোলে যে-আনন্দের ছবি দুলছে, তার থেকে কি শেষ পর্যন্ত আমরা এক 'জনমভরা ব্যথা অতলা'কেই তুলে আনছি না ? কথাটা কেবল এই নয় যে আনন্দ-চিহ্নিত ওই অল্প কয়েকটি গানের পাশে আমরা

পেয়ে যাব উলটো দিকেরও কিছু গান, যেখানে ভোরের বেলায় 'জেগে দেখি আমার আঁখি আঁখির জলে গেছে ভেসে', যেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে 'ঘরভরা মোর শূন্যতারি বুকের পরে', যেখানে 'কে যে আমায় কাঁদায় আমি কী জানি তার নাম' অথবা যেখানে 'দুটি আঁখি বেয়ে আমার পড়েছে জল ঝরে।' কথাটা এই যে, 'গীতাঞ্জলি'র সমস্ত অহংকারকে চোখের জলে ডুবিয়ে দেবার যে-প্রার্থনা ছিল, 'গীতিমাল্যে'র গানে পৌঁছে যেন অর্জিত হলো সেই চোখের জল, এক অতল কালো স্নেহের মাঝখানে নিজেকে এখানে আবৃত করতে পারছেন কবি। 'গীতাঞ্জলি'তে সাধনা ছিল, 'গীতিমাল্যে' আছে বেদনা। 'গীতাঞ্জলি' উপনন্দের গান, 'গীতিমাল্য' অমলের।

২

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিকে অবশ্য এক অচ্ছিন্ন প্রবাহেই দেখতে অভ্যস্ত আমরা, আর বড়ো আয়তনে ভাবতে গেলে তেমন করে দেখাই সংগত নিশ্চয়, এর ভিতরকার প্রভেদের কথা জেগে ওঠে কেবল অনুপুঙ্খের বিচারে। সেই বিচারে এসে পৌঁছলে আমাদের মনে পড়ে যে 'গীতাঞ্জলি' আর 'গীতিমাল্যে'র সময়ের দূরত্বও কম নয় বড়ো। প্রায় দেড় বছরের শূন্যতা এ দুটি বইয়ের মাঝখানে, যে-শূন্যতাকে ভরে রেখেছে তাঁর রোগজীর্ণতা, তাঁর মৃত্যু-কল্পনা, দেশ থেকে তাঁর দূরে চলে যাবার আকাঙ্ক্ষা। এই শূন্যতার কথাটা যে আমাদের তত মনে থাকে না তার একটা কারণ হয়তো ১৩১৬ সালে লেখা 'গীতিমাল্যে'র প্রথম তিনটি গান[১], যা 'গীতাঞ্জলি'রও

১ 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে' গানটির তারিখ নিয়ে অবশ্য খানিকটা সংশয়ের অবকাশ আছে।

অংশ হতে পারত, 'ওগো শেফালিবনের মনের কামনা' যেমন। 'গীতাঞ্জলি'র আরো কয়েকটি গানের মতো এটিও উঠে আসতে পারত 'শারদোৎসব' নাটক থেকেই, বস্তুত এটি লেখাও হয়েছিল ওই নাটকেরই পরবর্তী এক অভিনয়ের জন্য। কিন্তু এই গান তিনটির পর, হঠাৎ আমাদের ঝাঁপ দিয়ে পৌঁছতে হবে একেবারে ১৩১৮ সালের চৈত্রে, শুরু হবে নূতন গানের স্রোত।

এই স্রোতের কাছে এসে কবিমনের যে-টানাপোড়েন আমরা লক্ষ করব, তা কেবল মৃত্যু আর জীবনের বুনোন নয় আর, এর মেঘমলিনিমা আসছে আরো একটা সংঘর্ষের চাপ থেকে। অল্প-দিনের মধ্যেই সম্ভব হবে তাঁর ব্যাহত বিদেশযাত্রা, ইংল্যাণ্ডের নবীন ভাবুকসমাজের মধ্যে গিয়ে পৌঁছবেন তিনি এবার। 'জীবন যখন ছিল ফুলের মতো' তখনকার অবস্থা আর নেই বলে টের পাবেন হঠাৎ, সমাদরে-সমাদরে বিশ্ব তাঁকে জানিয়ে দেবে যে 'আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই / হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।' রসের ভারে অবনত হয়ে 'পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে', এই বোধের মধ্যে তৃপ্তি যেমন আছে, হাতে যে আর বেশি কিছু নেই এই অতৃপ্তিও তেমনি জমতে থাকে সেখানে। সম্মানের মণিহার গলায় এসে পৌঁছল বলেই তাঁর কাছে এবার জরুরি হয়ে উঠল এক নেপথ্যসন্ধান, নিবৃত্তির পথ, বহির্মুখী টান বড়ো হয়ে উঠল বলেই তাঁর দরকার হলো এক অন্তর্মুখী আত্মস্থতার। 'গীতাঞ্জলি'র তুলনায় এইখানে তাই আরো বড়ো হয়ে এল টানাপোড়েন।

বিদেশের রসিক বন্ধুরা তাঁর রচনা পড়ে যে-উচ্ছ্বাস জানাচ্ছেন, তার খবর অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন তাঁর তরুণ অনুরাগীদের কাছে, অজিতকুমার চক্রবর্তী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বা সন্তোষকুমার মজুমদারদের। কিন্তু জানাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সতর্ক করছেন তাঁদের, এ নিয়ে যেন হাটের মধ্যে কোনো মাতামাতি না ওঠে। সাধনার ফল যে কোথাও গিয়ে পৌঁছল সেইটুকু জানাই ভালো, বলছেন তিনি, তার-বেশি কোনো মত্ততাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। আর, এই যে-কথা তিনি জানাচ্ছেন তাঁর বন্ধুদের, সে কি এক হিসেবে তাঁর নিজেরই কাছে জানানো নয়? অজিতকুমার লিখেছেন: 'ইংলণ্ডে গুণীসমাজ কবির গলায় যে প্রশংসার মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে একটিমাত্র গান গীতিমাল্যে আছে—এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।' একটিমাত্র গান? প্রত্যক্ষত হয়তো তাই; কিন্তু একটু ভিতরদিক থেকে দেখলে মনে হবে যে 'গীতিমাল্যে'র উত্তরাংশের একটা বড়ো আবেগই আসছে কেবল ওই বোধ থেকে, বাইরের মত্ততা থেকে নিজের কেন্দ্রকে বাঁচিয়ে রাখবার এক সতর্ক বোধ। এভাবে দেখলে বোঝা যায় যে 'এ মণিহার' কোনো বিচ্ছিন্ন গান নয়, তার ঠিক ছ-মাস পরে লেখা এসব গানেও আছে ওই একই অনুভব:

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে।
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে।
তাকায় সকল লোকে
তখন দেখতে না পাই চোখে
কোথায় অভয় হাসি হাস আপন আসনে।
কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে
তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে।
যা শোনাবার আছে
গাব ঐ চরণের কাছে
দ্বারের আড়াল হতে শোনে বা কেউ না শোনে।

সভা আর ঘরের এই বিরোধে, সবার আর একার এই বিরোধে যে 'গীতিমাল্যে'র অনেকগুলি গান ভরে আছে, তা একেবারে আকস্মিক নয় নিশ্চয়। 'বীণাখানি পড়ুছে আজি সবার চোখে' অথবা 'কখন সে যে সভা ভেঙে আড়াল হবে', এই আত্মবিলাপ আমরা কেবলই শুনতে পাব এখানে। 'এ মণিহার' গানটির পরদিনই কবি লিখবেন 'মনে হল আকাশ যেন কইল কথা কানে কানে'। সেই নিভৃত ভোরের সংলাপ থেকে তিনি অর্জন করে নিতে চাইবেন তাঁর জীবনশক্তি, ঘরকে তিনি করে তুলবেন তাঁর আত্মহত্যার মুদ্রা। তাই ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়ে পথে ঘোরাকে নিষ্ফল মনে হবে তাঁর, তাই জ্যোৎস্নারাতে সবাই যখন বনে চলে যায় তখনো তাঁকে বহু যত্নে সাজিয়ে রাখতে হবে তাঁর নিরালার ঘরখানি, যেন কোনো প্রেরণার মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষায়, 'যদি আমায় পড়ে তাহার মনে'। এ কি আত্মহত্যাই শুধু? এ কি সৃষ্টিশক্তিও নয়? একেবারে ভিন্ন দেশের আধুনিক এক কবি, জাঁ ককতো, তাঁর সৃষ্টিপ্রেরণার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে কবি আছেন তাঁর রাত্রির অধিকারে, কোনো এক গহন আবির্ভাবের জন্য তাঁকে ধুয়ে মুছে রাখতে হয় ঘর। অমলেরও সামনে এসে রাজকবিরাজ বলেছিলেন: 'এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্যে পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখো।' এ হলো তবে সেইসব ঘর, যেখানে দাঁড়িয়ে জীবনকে আর সুন্দরকে তার অন্তঃস্বরূপে দেখতে পাওয়া যায়। এই দেখা থেকেই জেগে ওঠে মৃত্যু, মৃত্যুর ভূমিকায় জীবন, এই দেখা থেকেই জেগে ওঠে শিল্প। মৃত্যু আর শিল্প এইভাবে কখনো এক জায়গায় এসে মিলে যায়। আত্মহত্যির সঙ্গে-সঙ্গে, 'গীতিমাল্যে'র গানগুলি যেন সেই শিল্পসৃষ্টিরও নেপথ্যঘর। তাই এত বেশি গানের গান ছড়িয়ে আছে

এই বইটিতে, তাই এখানে এমন করে তিনি বলতে পারেন যে 'প্রাণে গান নাই মিছে তাই ফিরিনু যে' অথবা 'প্রকাশ করি আপনি যদি / তবে আমার দুঃখ মেটে।'

লণ্ঠন হাতে ঘরে-ঘরে চিঠি বিলোবার যে-স্বপ্ন দেখেছিল অমল, সে-ও কি এই সুন্দরেরই প্রকাশবেদনা নয়? সে-ও কি 'গীতিমাল্যে'রই মতো বলে ওঠা নয় 'বাজাও আমারে বাজাও'?

৩

কিন্তু এই ঘরের কথাটা নিয়ে একটা সন্দেহ উঠতে পারে। ঘর যদি সেই নিবিড়তার কেন্দ্র, 'গীতিমাল্যে'র গানগুলিতে সে-ঘর তবে নেতির চিহ্ন নিয়েও আসে কেন অনেক সময়ে? 'ঘরেই তোমার আনাগোনা, পথে কি আর তোমায় খুঁজি' এ-কথা বলেছিলেন বটে কবি, কিন্তু সেই একই সঙ্গে কি তিনি বলেননি যে ঘর তাঁকে বেঁধে রাখছে গ্লানিরও দিকে? রাজপুরীতে বেলাশেষের তান শুনে যে-পথিক চলছিল, তার তো আক্ষেপ 'ঘরে আমার রাখতে যে হয় বহু লোকের মন।' এ কোন্ ঘর তবে? এ কি আর হতে পারে জ্যোৎস্নারাতে ধুয়ে নেবার সেই ঘরটি?

এই প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়ালে দেখতে পাব যে ঘর আর পথ এ-গানগুলিতে কেবলই যেন জায়গাবদল করে, দেখা দিতে থাকে বিপরীত দুই চেহারায়। 'পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার', 'যা পাব তা পথেই পাব', 'আজকে পথে বাহির হব বহি আমার জীবন জীর্ণ' অথবা 'এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে'র মতো কথা যখন বলেন তিনি, পথের সাধনা যখন জেগে ওঠে তাঁর গানে, তখন ঘর হয়ে দাঁড়ায় শুধু বদ্ধতা, শুধু বন্ধনচিহ্ন, তখন তাঁকে

বলতেই হয় 'ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি।' কিন্তু পথ যখন শুধু বেচাকেনার ছবি, 'কেবল মাথায় বোঝা বহে হাটের মাঝে আনাগোনা', তখনই ধিক্কার দিয়ে বলতে হয় তাঁকে 'ওরে তুই নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি, কী লাগি ফিরিস পথে দিবারাতি'।

কেবল ঘরের কথাই কি শুধু? 'আমি'র কথাও কি নয়? তাঁর 'আমি'ও কি আসে না এমনি দুই ভিন্ন চালে? 'আমি আমায় করব বড়ো, এই তো আমার মায়া', এর সব আমি কি একই রকম?[২] একটি কি নয় বাইরের, একটি ভিতরের? 'আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুকে নানা আড়ালের ভিতর দিয়া নিবিড় সুখেদুঃখে আপন করিয়া লওয়া তাহার পরিপূর্ণতা' : গদ্যের এই কথাটিই হয়ে উঠল গানের ওই লাইন, গদ্যের 'সে' গানের 'আমি' হয়ে উঠল। একেবারে দুই বিরোধী আবেগকে এই যে এভাবে ধরতে চাইছে শব্দগুলি, সেটা কি অসংগত, না এর কোনো মানে আছে কোথাও? মানের একটা ইশারা হয়তো মেলে যখন আমরা শুনি 'চরাচরের হিয়ার কাছে তারি গোপন দুয়ার আছে', যখন এক 'জগৎজোড়া ঘরে'র কথাও বলেন কবি। আর এইখানেই, আরো একবার আমাদের মনে পড়ে 'ডাকঘরে'র অমলকে। 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ' হতে পারত অমলের গান, সমস্ত নাটক জুড়ে অমল তো তার পথের ছবিতেই বিভোর। কিন্তু সেই একই সঙ্গে

২ এটা লক্ষণীয় যে ইংরেজি অনুবাদে এই 'আমার মায়া' হয়ে দাঁড়াল 'Such is *thy* maya'। 'গীতিমাল্যে'র প্রথম সংস্করণ থেকে এটি ছাপা হয়ে আসছে 'আমার মায়া' হিসেবে। একেবারে হাল আমলের সংস্করণটিতে (১৩৭৯), 'প্রবাসী' পত্রিকায় মুদ্রণের নজিরে, শ্রীকানাই সামন্ত এই পাঠটির শোধন করলেন : 'তোমার মায়া'।

সে বলতে পারে : 'আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে—এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে।' ঘরের মধ্যে তখন পথ এসে পৌঁছয়, আর পথের মধ্যেও সে দেখতে পায় ঘরের নিশানা, জগৎজোড়া ঘর। ঘর যখন হয় এই জগৎজোড়া ঘর, তখন তার আর ভয় নেই কোনো। 'রাজা'য় যেমন অন্ধকার দিয়ে ধুয়ে দিতে হয়েছিল মিথ্যে আলোর ভুল, অন্ধকারের বোধকে বুকে নিয়ে সুদর্শনাকে যেমন এসে দাঁড়াতে হয়েছিল প্রত্যক্ষের জীবনে, এ-ও তেমনি। ঘরের বোধ নিয়েই তখন পৌঁছনো যায় খোলা পথের মাঝখানে, তখন আর বিলাপ করে বলতে হয় না 'বাহিরপানে চোখ মেলেছি, হৃদয়পানেই চাইনি', একাকার হয়ে যায় তখন ঘর আর পথ, সে আর আমি।

আলো-অন্ধকারের এই সংকট, ঘর আর পথের এই দ্বিধা, বাহির আর ভিতরের এই সংঘাত এখানে যে একেবারে নূতন কিছু তা অবশ্য নয়। কিন্তু এ-গানগুলির অল্প পরেই কবিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে যে বিপুল পথের টানে, 'বলাকা'র মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক কালের যে মথিত আহ্বান এসে পৌঁছবে তাঁর কাছে, বিশ্বভূমিকায় যেভাবে সন্তবাণী নিয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁকে, যে নূতন স্ফূর্তিতে জেগে উঠবে তাঁর অমোঘ সৃষ্টিকল্পনা, তারই এক নেপথ্য-শক্তির আয়োজন হিসেবে 'গীতিমাল্যে' এই ঘরের নির্মাণ অনেক তাৎপর্যময় হয়ে আসে। এই তাৎপর্যে রেখে বুঝতে পারি, 'অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো' কোনো অবসানের গান নয়, এর সন্ধ্যা নয় কোনো সত্যিকারের জীবনসন্ধ্যা। মৃত্যুরই একটা আবহ এখনো এর চারপাশে ঘিরে আছে বটে, কিন্তু সে-মৃত্যু কেবল জীবনের সেই অপবাহুল্যকে ঝরিয়ে দেওয়া, সৃষ্টির পথে যা

বাধা হয়ে দাঁড়ায়। 'ছড়ানো এই জীবন তোমার আঁধারমাঝে হোক না জড়ো' বলে কবি ফিরে পেতে চাইছেন কেবল সেই অন্ধকার যা আলোর অধিক, সেই ঘর যা পথের চেয়ে বেশি। ব্যাপ্ত জীবনের মাঝখান থেকে কবি এখানে সঞ্চয় করে নিতে চান তাঁর সমস্ত নির্যাস, ধরে রাখতে চান তাঁর সৃষ্টির গভীরতম বেদনা। তাঁর শিল্প-সৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে, অতল কালো অন্ধকারে ধুয়ে দেওয়া সেই একখানি ঘর ছড়িয়ে থাকে 'রাজা' থেকে 'গীতিমাল্য' পর্যন্ত, মৃত্যু যেখানে মৃত্যুই নয়, ছুটি যেখানে ছুটিই নয় কেবল, বরং আরো বড়ো কোনো যাপনের দায়ভার।

রিল্‌কে একটি চিঠিতে লিখছিলেন ১৯১৫ সালের নভেম্বরে : 'কে জানে, আমরা হয়তো দেবতাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি কেবল পিছন দিক থেকে। আমাদের মুখ আর দেবতার মুখ যেন তাকিয়ে আছে একই দিকে, হয়ে আছে এক। আর তাই যদি হলো, ঈশ্বরের সামনে ছড়ানো এই মহাশূন্য থেকে কীভাবে তবে আমরা এগোব তাঁর দিকে?'

বাঙালি যে-পাঠক এই চিঠিটি পড়েননি আগে, তাঁরও মনে হতে পারে কথাগুলি বড়ো চেনা, আমাদেরই সাহিত্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রায় আক্ষরিক এই বেদনার উচ্চারণ কি একদিন শুনিনি আমরা? আমাদের মনে পড়বে ওই চিঠিরই প্রায় সমকালে লেখা 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশের সেই নৈশ উদ্‌ভাস, দামিনীকে ডেকে যখন সে বলছিল, 'আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি, মনে একটুও সন্দেহ নাই।' জীবনের সত্য খুঁজে বেড়াবার একটা সীমানায় এসে শচীশ সেদিন পৌঁছেছিল এই ভাবনায় : 'যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন, আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে। ··· তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।'

রিল্‌কে তাঁর চিঠিতে বোঝাতে চাইছিলেন, বেঁচে থাকার মানে আছে কোথায়। 'আমরা যদি কেবলই আমাদের ভালোবাসায় অসম্পূর্ণ, আমাদের সিদ্ধান্তে অনিশ্চিত আর মৃত্যুর সামনে অসহায়, তবে ধারণাতীত এই জীবন নিয়ে এতকাল ধরে আমরা কোথায় চলেছি ?' রিল্‌কের এই প্রশ্নেরই যেন মীমাংসা করতে চেয়েছিল শচীশ তার প্রত্যক্ষ জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে। ননিবালা বা দামিনীর ভালোবাসায় অসম্পূর্ণ, জ্যাঠামশাই বা লীলানন্দের সিদ্ধান্তে অনিশ্চিত, নবীনের স্ত্রী বা ননিবালার আত্মঘাতের সামনে অসহায় শচীশ শেষ পর্যন্ত পৌঁছল এই বোধে : 'থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।'

কিন্তু এ কি কোনো নতুন পরিণতি হলো ? যদি আমরা ধরে নিই যে 'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার' বলতে-বলতে শচীশ যে অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলে গেল, এ যাওয়া এক সংসার-বিহীন শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ারই মতো, যদি 'অরূপের মধ্যে ডুব' দেবার এইটুকু অর্থই আমাদের মনে থাকে, তাহলে এ তো লীলানন্দ স্বামীর আখড়ার শচীশের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। সেই বিন্দুতেই কি সে আবার ফিরে গেল তবে ? প্রকৃতিকে একদিন মিথ্যা ফাঁদের মতো মনে হয়েছিল শচীশের, শ্রীবিলাসের সঙ্গে তর্কে সে বলেছিল যে চৈতন্যকে মুক্ত রাখতে হলে প্রকৃতির সমস্ত দূতীকে এড়িয়ে চলা চাই। রবীন্দ্রনাথের পাঠকমাত্রেই জানেন যে এই এড়িয়ে চলার চেষ্টা কোন্ ভয়াবহ প্রতিশোধ নিয়ে আসে বারেবারে, সেইটেই দেখাতে চান তিনি। তাই শ্রীবিলাস তার সহজ বুদ্ধিতে যে-কথা বলেছিল শচীশকে, তাকে আমরা ভাবতে পারি রবীন্দ্রনাথেরই বিশ্বাস হিসেবে, তার সেই কথা : 'প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই

আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে।'

"শ্রীবিলাস" খণ্ডে শচীশের ওই আবেগভরা অন্নপার্তির মধ্যে যদি এই থাকে যে রূপের স্রোত ঠেলে ফেলে চলে গেল সে, তাহলে উপন্যাস কি ঘুরে আবার সেই পুরোনো জায়গায় এসে দাঁড়াল? শচীশ কি আর বাড়ল না তবে? রবীন্দ্রনাথ কি এই দেখাতে চাইলেন যে চেতনার প্রবল তাড়নাতেও শেষ পর্যন্ত শচীশ কোনো সংগত চৈতন্যে পৌঁছল না, গেল ভ্রষ্ট হয়ে, উপন্যাসে বর্ণিত সেই ঝরা পাতার মতো? পরিবর্তে, অনেক অনায়াসে শ্রীবিলাস পেল জীবনের সেই স্বাভাবিক পূর্ণতা, যেখানে পৌঁছলে মৃত্যুমুহূর্তে দামিনীর মতো মেয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বলতে পারে 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই'?

শ্রীবিলাসের এই ছবিটিতে নিশ্চয় আমাদের পৌঁছে দিতে চান কবি, কিন্তু সেটা শচীশের বিনিময়ে নয়। অনেক সময়ে, অসতর্ক পাঠে, আমাদের মনে হতে পারে যে উপন্যাসটিতে শচীশকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অগোচরে, অপূর্ণতায়, কোনো এক শূন্যতার মাঝখানে। অনেক সময়ে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় যে এ-উপন্যাসের আছে এক শঙ্খিল (spiral) গড়ন, একবার পিছনে এসে একবার সামনে এগিয়ে চলছে এর গল্প। "দামিনী" খণ্ডের পরিশিষ্টে আভাসে বলা আছে ঘটনার পরিণতিপর্ব, পরে "শ্রীবিলাস" খণ্ডে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে ফেলে-আসা পুরোনো কথা। 'আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে', এইটুকু বলে রাখা ছিল "দামিনী"তে, আবার এই বিবাহের পরবর্তী ক'টা দিনের কথা বেড়ে উঠল

উপন্যাসের শেষ ক'টি পৃষ্ঠায়। ঔপন্যাসিক গড়নের এই বৈশিষ্ট্যের মাঝখানে, "দামিনী" খণ্ডেই, জরুরি একটি কথা বলা ছিল সন্তর্পণে : 'সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।' এই কাজ, আর দামিনীর বিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার সময়েও সংক্ষেপে সে যে বলেছিল 'আমার কাজ অজস্র', এর সঙ্গে যদি মিলিয়ে নিই 'আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি, মনে একটুও সন্দেহ নাই'-এর গাঢ় উচ্চারণকে, তাহলে বুঝতে পারি যে শচীশের 'অরূপের মধ্যে ডুব' তার কাজের সংসারেই ডুব। জ্যাঠা-মশাইয়ের সঙ্গে একদিন কাজ করত সে, তখন সে এই বস্তুপৃথিবীর বাইরে জানত না আর কিছুই, মানত না প্রত্যক্ষের চেয়ে বড়ো কোনো সত্তা। কিন্তু এবার আবার যে প্রত্যক্ষের মধ্যে কাজের মধ্যে ফিরে এল শচীশ, তার ভিতর দিয়েই সে ধরতে পারে বস্তুপৃথিবীর বাইরের কোনো অভিভব, গোটা জীবনের পরিচয়। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর তার ছিল এই প্রশ্ন : 'একভাবে যাহা 'না' আর-একভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।' এইখানে এসে সে একই বিন্দুতে একই মুহূর্তে 'হাঁ' এবং 'না'-এর মিলন খুঁজে পেল একটা, বিরাট এক প্রবাহের মাঝখানে রেখে দেখতে পেল তার জীবনযাপনকে, এইখানে শান্ত হয়ে এল তার উপলব্ধি; জীবন আর মৃত্যুর, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষের বিরোধকে মিলিয়ে নিতে পারল একটা জায়গায়।

রিলকে তাঁর সেই চিঠির শেষে বলেছিলেন, প্রেমিকেরা দেখতে পায় ছিদ্রের মধ্যেই সমগ্রকে, সেই সমগ্রের ঈশ্বর তাদের কাছে সত্য,

মৃত্যুও তাদের কোনো হানি নয়। শচীশও যেন শেষ পর্যন্ত পৌঁছল এই বিশ্বাসে, যেখানে কাজের মধ্যে থেকে সে এবার জানে যে তার চারপাশে সকলেই দাঁড়িয়ে আছে ইতি আর নেতির এক মিলন-মোহনায়, যেমন রিল্‌কে ভেবেছিলেন, 'for being full of life, they are full of death'। দামিনীর মৃত্যুর মুহূর্তে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে সবচেয়ে বড়ো প্রেমের মুহূর্ত, যার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীবিলাস। আর, সমস্ত অতীত মৃত্যুকে বুকে নিয়ে জীবনের মধ্যে আছে আজ শচীশ। কাজ আর ভালোবাসার এই দুই মুখ রইল খোলা, এইখানে এসে শেষ হলো আত্মতাময় এ-উপন্যাস।

২

'চতুরঙ্গে'রই প্রায় সমকালে লেখা চলছিল 'গীতালি'র গানগুলি। মনে প্রশ্ন জাগে, 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত কবিরও যে-আত্মসন্ধান আর আত্মপ্রতিষ্ঠা চলছে, তার সঙ্গে শচীশের এই ইতিহাসের কোনো সমধর্ম কি নেই? এই হলো রবীন্দ্রনাথের জীবনের সেই পর্ব, যেখানে তিনি সত্যের সমস্ত কেন্দ্রটিকে স্থির করে নিচ্ছেন, যেখানে সমস্ত সংশয়-যন্ত্রণার অবসানে শান্ত বিশ্বাস নিয়ে কাজের ভূমিতে নেমে আসছেন আবার। দূরবর্তী কোনো ভূমির সঙ্গে সংলাপের মধ্য দিয়ে শচীশ যেমন বুঝে নিচ্ছিল অস্তিত্বের মানে, সেইরকমই এক সংলাপে ভরে আছে 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গীতালি'। সংলাপের এ আমি-তুমি যে আমাদের চেতনারই এক দ্বৈধ, দেশে-দেশে যুগে-যুগে ভাবুকেরা সে-কথা কেবলই বলেছেন, বলেছেন যে এই দ্বৈধই আমাদের টেনে নেয় এক ঈশ্বরভাবুকতার চেহারায়। হেগেল একবার লিখেছিলেন, নিজের সঙ্গে কথা বলা আমাদের

ভাবনাপদ্ধতির এক স্বাভাবিক রীতি, মিশরের মরুভূমিতে বা আল-পাইন তপোগৃহে জীবনজোড়া ধ্যানী মানুষেরাও তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এরই ধরনে, একেই তাঁরা নাম দিয়েছেন আত্মর সঙ্গে ঈশ্বরের কথাবার্তা। এ-কথাবার্তা তো আর কিছু নয়, নিজের আর সেই সূত্রে গোটা জীবনের প্রতি নিজের বিস্ময়, প্রশ্ন আর সমর্পণ, যা নিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের আত্মবোধের এক নাটক।

এলোমেলো আমাদের দৈনন্দিন জীবন, নানারঙা নৈরাজ্য তার, শুদ্ধ-অশুদ্ধের কোনো ভেদরেখা নেই সেখানে, কিছুই সেখানে পৌঁছে দেয় না আমাদের মর্মে, কোনো সারাৎসারে। সবকিছুই বহমান, সবই ভাঙা কিংবা নষ্ট, কিছুই আমাদের হাতে তুলে দেয় না কোনো সত্য, কোনো অথেন্টিসিটি। যা-কিছু ঝাপসা আর অনিশ্চিত আমাদের জীবনে, তার প্রতি আমাদের অনুরাগ ; সত্যের মুখচ্ছবি আমাদের ভয় পাইয়ে দেয়। এই সাধারণ জীবন যে যাপন করছে সে জানে না, নদী কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে। এই অনিশ্চয় থেকে মুক্তি আসে যখন, খুলে যায় তখন অস্পষ্ট অনুভবের পোশাক, নগ্ন নির্যাস নিয়ে মন দাঁড়ায় এক উপলব্ধির কাছে, এই দাঁড়ানোই হলো ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানো।

কথাগুলি লুকাচের। কিন্তু হতে পারত তা পাস্কালের 'পাঁসে'র অথবা রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতনে'র। 'পাঁসে'র শততম সূত্রটিতে যেমন বলেছিলেন পাস্কাল, মানুষ তার আমিময় ছদ্ম পোশাকটি দিয়ে কেমন করে ঘিরে রাখে নিজেকে। বড়ো হতে চায় সে, কিন্তু কেবলই হয় ছোটো ; সুখী হতে চায় সে, কিন্তু কেবলই দেখে সর্বনাশ ; যোগ্য হতে চায় সে, কিন্তু সীমা নেই তার অযোগ্যতার। নিজের এই অক্ষমতার পুঞ্জ যে ঘিরে রেখেছে তাকে, সেটা কি জানতেও

চাইবে না সে? কেমন করে ছিঁড়বে তবে জাল? 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায় সেই জালেরই কথা বলছিলেন রবীন্দ্রনাথ দিনের পর দিন, বলছিলেন, 'এই-যে আমিত্ব বলে একটা জিনিস, এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত কিছু হতে আমি স্বতন্ত্র।...আমিই হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।' এই বিচ্ছিন্নতার বেদনাই রবীন্দ্রনাথের প্রধানতম বেদনা, এইখানেই আছে তাঁর সমস্ত শিল্পের কেন্দ্র, আর এই কেন্দ্রটিকেই তিনি গভীরভাবে অর্জন করে নিচ্ছিলেন তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র পর্বে। যাকে তিনি ভাবেন আত্মবোধের জাগরণ, যাকে তিনি বলেন আমাদের আত্মশক্তি, সে কেবল দূর করে নিতে চায় এই বিচ্ছেদ, সে কেবল দেখে : 'এমনি করে আমি এবং আমি-নার মধ্যে কেবলি আনাগোনার জোয়ারভাঁটা চলছে। ... বিশ্বআমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ খেলাখেলি।' এইখানে যা এল বিশ্বআমি বা আমি-না শব্দে, অন্যভাবে যাকে কখনো তিনি বলেছেন আমারই ভিতরকার এক আমি, কবিতা বা গানে তাকেই রবীন্দ্রনাথ যখন তুমির নামে সাজিয়ে দেন, তখন তাঁর রচনায় যে ঢেউ-খেলাখেলি আমরা দেখতে পাই, তা এই তুমি-আমির ঢেউ, তুমি-আমির সংলাপ।

এই সংলাপে, এই খেলায়, তিনটে ভিন্ন স্তর হয়তো লক্ষ করতে পারি আমরা। এক পরম চেতনার (কনট্রাইট কনশাসনেস) কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন হেগেল, ব্যক্তি আর পরমের মধ্যে যোগ তৈরি করবার পথে আছে তিনটি পরম্পরা। প্রথমে দেখি এই ব্যক্তি

আর পরম আছে যেন কোনো বিচ্ছেদের সম্পর্কে, দ্বন্দ্বে; পরে বুঝি যে ব্যক্তি তো পরমেরই অংশ মাত্র; তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সে; আর তারপর আসে এক প্রগাঢ় মিলনের স্তর, ব্যক্তিজীবন তখন মিশে যায় বিশ্বজীবনের মধ্যে। আক্ষরিকভাবে এই তিনটি স্তরের সমান্তরাল নয় হয়তো, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আত্মবোধেরও আছে তুলনীয় তিনটি পর্যায়, খুঁজে পাওয়া যাবে তিন অঙ্কের ছোটো এক নাটক।

৩

এ-রকমই এক নাটক কীভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে 'গীতাঞ্জলি' 'গীতি-মাল্য' আর 'গীতালি'র মধ্যে, তার একটা ইঙ্গিত পেতে পারি যদি এই তিন বই থেকে প্রায় একইরকমের তিনটি গানকে আমরা মিলিয়ে দেখি। ঝড়ের রাত্রি রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতার এক প্রিয় অনুষঙ্গ, তীব্র কোনো অভিজ্ঞতার উদ্দীপন হিসেবে এই পট-ভূমি তিনি গড়ে তোলেন প্রায়ই। 'গীতাঞ্জলি'র তেমনি এক ঝড়ের গান 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' আমাদের মনে করিয়ে দেয় অন্য দুটি গানের কথা, 'গীতিমাল্যে'র 'যে রাতে মোর দুয়ার-গুলি ভাঙল ঝড়ে' অথবা 'গীতালি'র 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি / ঝড় এসেছে, ওরে এবার ঝড়কে পেলাম সাথি।' তিনটি গানেই আছে ঝড়, রাত্রি, আছে আকাশ, অন্ধকার, আর আছে এক যাওয়া-আসার ছবি। তাই প্রথমে হঠাৎ মনে হয় এ-তিনটিতে আছে যেন একইরকমের কোনো ভাবনা, যেন একই গানের তিন সম্প্রসারণ।

কিন্তু যাওয়া-আসার এই ছবিটিকে একটু যত্ন করে বুঝে নিতে গেলেই গান তিনটি ভিন্ন হয়ে যায় খুব। 'গীতাঞ্জলি'র

গানটিতে আমি আছে ঘরের দুয়ারে প্রতীক্ষায়, আর সুদূরে কোন্ নদীর পার ধরে, গহন কোন্ বনের ধার দিয়ে, কোন্ অজানা পথ দিয়ে কেবলই সেখানে চলে আসছে কোনো এক 'পরানসখা বন্ধু'। ঝড়ের এই প্রবলতাটুকু না থাকলে, এই চলে আসাকে 'ডাকঘর' নাটকে অমলের দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেত, অমলও দেখেছিল এম্‌নি এক কেবলই চলে আসা কেবলই নেমে আসার ছন্দ, তার রাজার প্রতীক্ষায়। আর সেই 'ডাকঘরে'রই অন্তিমে যেমন তার ঘরের বাইরের প্রাচীরগুলি ভেঙে যায় সব, 'গীতিমাল্য'তে পৌঁছে তেমনি দুয়ারগুলি ভেঙে পড়ল ঝড়ে। 'ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা' তা হয়তো মানতে চায় না অনেকে, তবু 'ডাকঘরে'র ফকিরের মতো এখানে কেউ হয়তো বুঝতে পারে 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কী / ঘরভরা মোর শূন্যতারি বুকের পরে।' যে-বন্ধু ছিল বাইরে, 'গীতিমাল্যে'র গানটিতে সে তবে ঘরে এসে পৌঁছল আপাত এক সর্বনাশের মধ্য দিয়ে, আর 'গীতালি'তে দেখতে পাব আমিই এল বেরিয়ে। 'গীতাঞ্জলি'র আকাশ কাঁদছিল 'হতাশসম', কিন্তু 'গীতালি'তে এবার আকাশকোণে সর্বনেশে উঠছে হেসে, এতদিনকার প্রতীক্ষাকাতর আমি এবার বেরিয়ে পড়েছে গভীর অন্ধকারের মাতামাতির পথে। 'গীতাঞ্জলি'তে ছিল আমির দিকে তুমির চলা, 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে', আর 'গীতালি'তে তুমির দিকে আমি, কেননা এখানে এসে 'আমি নিত্য পথের পথী'। তা যে হতে পারল তার কারণ, এদের মাঝখানে 'গীতিমাল্যে' দুয়ার গিয়েছিল ভেঙে, তুমি এসে দাঁড়িয়েছিল আমির ঘরে, আমিরই মধ্যে। তাই, 'সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি / সেই তো আমার তুমি' এই বোধের পূর্ণতায় এসে পৌঁছল 'গীতালি', যেমন লুকোনো এক

ঐশ্বরিক বোধকে বুকে নিয়ে একদিন কাজের জগতে পৌঁছে গিয়েছিল 'চতুরঙ্গে'র শচীশ।

খুব কি সরলীকরণ হবে যদি বলি, গানতিনটির ওই প্রভেদ থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি বইতিনটিরই প্রচ্ছন্ন এক ভিন্নতা? প্রতিবাদের ধরনে কেউ হয়তো মনে করিয়ে দেবেন যে দুয়ারভাঙা আবির্ভাবের গান তো আছে 'গীতাঞ্জলি'তেও, আছে 'গীতালি'তেও। আছে, কিন্তু একটা প্রভেদও কি নেই? 'গীতাঞ্জলি'তে যখন শুনি 'নিশার স্বপন ছুটল রে, এই ছুটল রে', সেখানে তখন পাই বটে এই ছবি:

দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি হেসে
নয়নজলে ভেসে হৃদয়
চরণতলে লুটল রে।

কিন্তু এখানে ঘর ভেদ করে যে এসে দাঁড়ায় সে তো আলো, তার জয়ধ্বনি তো প্রত্যাশিত, যেমন প্রত্যাশিত জ্যোতির্ময় এক প্রভাত-সূর্যের আবির্ভাব আছে 'গীতালি'তেও। কিন্তু 'গীতিমাল্যে'র গানটিতে যে আবির্ভাব, তার আছে এক উলটো দিক। সেখানে 'সব যে হয়ে গেল কালো', সেখানে 'গীতাঞ্জলি'র 'আকাশ হতে প্রভাত-আলো / আমার পানে হাত বাড়াল' উলটে দিচ্ছে তার ছবিটা, সেখানে হয়ে উঠছে 'আকাশপানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে'। আক্ষরিক অর্থে প্রতিটি গানকেই এমন কোনো পরিকল্পনার ছকে বাঁধতে গেলে একটা যান্ত্রিক বিন্যাস তৈরি হবে হয়তো, কবিতার আবেগ সে-বিন্যাসকে কেবলই নিশ্চয় ভেঙে দেয় ভিতর থেকে, তাহলেও ব্যাপকভাবে এ-কথা বলার একটা মানে আছে যে এই

তিনটি বইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা কবিমনের পরিণতির ভিন্ন তিনটে স্তর ধরতে পাই। দৈনন্দিনতার যে তুচ্ছ আমি ব্যক্তিসীমায় বেঁধে রাখে আমাকে, আমার ভিতরকার তুমির বোধে পৌঁছে খসে পড়ে যেটা, সেই আমির হাত থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষাই অনেক বড়ো জায়গা নেয় 'গীতাঞ্জলি'তে, 'গীতিমাল্য'তে আছে এই মুক্তির জন্য অন্তর্গূঢ় আয়োজন, আর 'গীতালি'তে এসে মনে হয় সেই আয়োজন যেন পূর্ণ হয়ে এল, যেন এবার আমি মিলল এসে তুমির মধ্যে। তুমি আসছ আমার দিকে, কিন্তু তোমার অভিসারে পথে বেরোলে কেবলই দেখি আমার এক বাধা, এই বেদনা 'গীতাঞ্জলি'র। কী সেই বাধা? 'সে যে আমার আমি, প্রভু' এই হলো তার উত্তর। একদিন যখন 'আমার আমি ধুয়ে মুছে / তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে', তখনই তো জাগবে পূর্ণতা? যতদিন তা না হয়, ততদিন? 'অন্তরেরি অন্তঃপুরে থাক রে ততদিন।' বলা যায়, 'গীতিমাল্য' যেন এই অন্তঃপুরের কাজ করছে তার প্রগাঢ় মূলে। সে-কাজ শেষ হয়ে এলে যেখানে পৌঁছনো যাবে তার আদলটাও বলা আছে 'গীতাঞ্জলি'তেই :

যখন তোমার শক্তি হবে
    উঠবে ভরে প্রাণ
আগুনভরা সুধা তাঁহার
    করবি যখন পান –
বাইরে তখন যাস রে ছুটে
থাকবি শুচি ধুলায় লুটে
সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
    বেড়াবি স্বাধীন –
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
    থাকরে ততদিন।

'গীতালি'তে কেন পূর্ণ হলো এই আশ্বাস, মিলল এই আগুনভরা সুধা, আর এই বাইরে ছুটে যাওয়ার দীপ্তি।

'গীতিমাল্যে'র তুলনায় 'গীতালি'র গানে আগুনের আভা যে অনেক বেশি, 'আগুনের পরশমণি' যে স্পষ্ট হলো সেখানে, সেইটেই একমাত্র কথা নয়। ঘরের আয়োজন ফুরোল বলেই 'গীতালি'তে আমরা কেবলই পাব পথে বেরিয়ে আসার চিত্রমালা,[১] যে-ছবি 'গীতিমাল্যে'র ১১১টি গানে কয়েকবারের বেশি নেই। 'গীতাঞ্জলি'তে পথ আর ঘরের দ্বন্দ্ব-ছবি ছিল অনেক, ছিল বেরিয়ে আসার আয়োজন, আর কিছু ছিল তুমির আসার পথ, প্রকৃতির আনন্দ কখনো-বা। 'গীতিমাল্যে' পৌঁছে এই সবই হঠাৎ সরে যায় অনেকখানি। আর 'গীতালি'তে ঝাঁপিয়ে এল রুদ্রতালে আমির যাবার পথ, কেননা 'পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া', কেননা 'পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ / সেই তো তোমার গেহ'। খোলা হাওয়া

১ বইতিনটিতে পথের ছবির ব্যবহার হয়েছে কতটা, তার একটা অস্পষ্ট ছক এখানে রাখা হলো। সংখ্যাগুলি লক্ষ করবার সময়ে এ-ও মনে রাখা চাই যে 'গীতাঞ্জলি'তে রচনার সংখ্যা ১৫৭, 'গীতিমাল্যে' ১১১ আর 'গীতালি'তে ১০৮।

	পথ-ঘরের দ্বন্দ্ব	পথে বেরোবার আয়োজন	পথে-বেরোনোর ছবি
গীতাঞ্জলি	৩০	২০	১২
গীতিমাল্য	১১	১৩	৬
গীতালি	৪	৫	৩৬

'গীতাঞ্জলি'তে অল্পকয়েকটি আছে হৃদয়পথের কথা, আর কয়েকটি পথের ছবি আছে প্রকৃতির গানে। এই হিসেবের মধ্যে সেটা ধরা নেই।

লাগল প্রাণে, ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে, চলতে হবে সামনে সোজা, পথের খবর পাখির পাখায়, পথে চলার নিত্য রসে, পথিকবঁধু পাগল করে, জ্বলতে দে তোর আগুনটারে, এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে—এইরকমই সব জলে-আগুনে মেতে-ওঠা জীবনের স্বাদ এখানে দেখা দিতে শুরু করেছে, কেননা এবার ধুয়ে-মুছে গেছে তার আমি। 'গীতালি'তে আর ভাবীকালের স্বপ্নে নয়, বর্তমানের ক্রিয়াপদেই বলা যায় : 'সেই আমি তো বাহনমাত্র, যায় সে ভেঙে মাটির পাত্র।' 'গীতালি'তে ঘোষণা করে তাই বলা যায় : 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া।'

বাইরে দাঁড়া : আমি-তুমির বাইরে এল আরো এক নতুন সম্বোধন, তুই। 'অন্তরের মধ্যে চৈতন্যগুহায় অন্ধকারে পরমজ্যোতির জন্য মানুষের তপস্যা চলেছে' বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালায়। চৈতন্যের এই জ্যোতিকে যদি 'তুমি' বলে থাকেন কবি বারেবারেই, চৈতন্যহীনতা যদি আমি, তাহলে আরো একটি সম্বোধনের দরকার হয় কেন তাঁর? এর একটা বাউল উৎস অনুমান করা যায়, কিন্তু সেই উৎসকে তিনি ব্যবহারে আনেন কীভাবে? কেবল 'গীতালি'র গানেই নয়, রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতার অনেক মুহূর্তেই দেখা যাবে যে, না-আমির এক ছড়ানো জীবনকে লক্ষ করতে চাইলেই, উদ্দীপনাময় এক সমবেত জীবনের লক্ষ্যে কথা বলতে চাইলেই, চলে আসে 'তুই' অথবা 'তোরা' অথবা 'আমরা', বঙ্গভঙ্গের দিনগুলিতে যেমন এসেছিল একবার। নিভৃতে প্রস্তুতির কাল সাঙ্গ হলো যখন, অন্তঃপুর থেকে পথে বেরিয়ে যেন বলা যায় তখন : 'এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে / তোর মাঝেতে উঠুক নেচে।' এরই সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে পারি যে, আমার মধ্যে

আমি আর তুমি যেমন নেতি আর ইতির চিহ্ন, বাইরের সমবায়ে তেমনি নেতি হয়ে আসে ওরা, আর ইতির বাহক তোরা। তাই আর আশ্চর্য লাগে না যখন দেখি যে 'গীতালি'র পথে বেরোবার আনন্দ কবিকে আজ খুঁজে নিতে দিচ্ছে অনেক সঙ্গী, আর বেড়েও গেছে এখানে তুই বা তোরার ব্যবহার। 'গীতিমাল্যে'র টানে 'একলা পথে চলা আমার করব রমণীয়' যদিও এ-কাব্যেও আসে দু-একবার, কিন্তু তবু এর প্রধান সুর হয়ে ওঠে আহ্বান, বহির্জগৎকে আহ্বান। নিজে জেনেছেন বলেই এবার সবাইকে ডেকে বলতে ইচ্ছে হয় তাঁর :

না রে তোদের রইতে দেব না রে
দিবানিশি ধুলাখেলায়
খেলাঘরের দ্বারে।

সেইজন্যই এবার বলতে চান তিনি : হবে না তোর স্বর্গসাধন, ধনী যে তুই দুঃখধনে, রাত্রি যে তোর ভোর হয়েছে, খুশি হ তুই আপন মনে, হিয়ার মাঝে দেখ্ না ধরে, সবার মাঝে পাবি ছাড়া, কিংবা,

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে।

দীক্ষা পেয়েছেন যিনি, দীক্ষা তবে দিতেও চান তিনি এবার। বাইরের সংসারের মধ্যে নেমে আসতে চান তিনি এবার, কাজের মধ্যে, শচীশের মতোই। কেননা শচীশের মতোই, এবার তিনি বুঝে নিয়েছেন তাঁর আত্মপরিচয়, বুঝে নিয়েছেন যে জীবনের যে-কোনো তুচ্ছেরও আছে এক মস্ত মর্যাদা, কেননা : পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে। নেপথ্যবাস শেষ হলো তাঁর, আবার তিনি সামাজিক আজ, শচীশের কাজে আর শ্রীবিলাসের ভালোবাসায়। তাঁর সেই কাজ

আর ভালোবাসা নিরন্তর শক্তি পাবে যে-কেন্দ্র থেকে, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির মধ্য দিয়ে তৈরি হয়ে উঠল তাঁর আত্মশক্তির সেই কেন্দ্র।

এ আমির আবরণ

'যোগাযোগ' উপন্যাসে বিপ্রদাস বলেছিল কুমুকে : 'সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয় কুমু, চিরকালটা থাকে আড়ালে ; গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।'

পড়বার পর প্রথমে মনে হতে পারে, এ তো তাঁর নিজেরই কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়ে দিলেন আরেকবার, গানের এই মুক্তির কথা কতবারই তো বলেছেন তিনি নিজে। অনেকদিন আগে 'ছিন্নপত্রে'র দিনগুলিতে ইন্দিরা দেবীকে যেমন লিখেছিলেন একবার : 'আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়—তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরাম-ব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে, কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী-এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পারস্পেক্টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না—একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্য দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আসে এবং মানুষের জন্ম-মৃত্যু হাসি-কান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে। সেইসঙ্গে আমাদেরও নিজ-নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং

একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই।' প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর, এই দীর্ঘ বিবরণেরই ছোটো একটা চেহারা জেগে উঠল কুমুর কাছে বিপ্রদাসের ওই কথাটিতে। তবে কি আমরা মনে করব, গানের এই প্রকৃতিব্যাখ্যা উপন্যাসে উঠে এল নিজেরই কথা বলে নেবার এক অসংগত ছল হিসেবে? উপন্যাসের পক্ষে নিতান্ত এক অলংকার?

তা যে নয়, সমস্ত বইটি জুড়ে গান আর সুরের ব্যাপ্ত ভূমিকা লক্ষ করলে সেকথা বোঝা যায় বেশ। ভালোবাসার সমস্যা নিয়েই গড়ে উঠেছে 'যোগাযোগ', কিন্তু চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে—ঘটনার গুরুতর মুহূর্তগুলিতে—সুরের প্রসঙ্গই যেন জায়গা নিয়ে থাকে অনেকখানি। একদিকে মধুসূদনের ক্লিন্ন আবেষ্টন, আর অন্যদিকে সেই সংকীর্ণ বন্ধন থেকে কুমুর বেরিয়ে আসবার তাড়না, দুই চরিত্রের এই বিপরীত ধর্ম প্রতিষ্ঠার একটা বড়ো উপায় এখানে হয়ে ওঠে গান বা সুর। বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গেছে যখন, কুমু তখন তার এসরাজ নিয়ে ভূপালি সুর বাজায়। অমঙ্গলের ছায়ার মধ্য দিয়ে বিয়ে হয়ে যাবার পর, দাদার সঙ্গে বিচ্ছেদের মুহূর্তগুলিতে কুমু শোনায় কানাড়া-মালকোষের আলাপ, বিপ্রদাস ফরমাশ করে সিন্ধু বেহাগ ভৈরবী, যেসব সুরে বিচ্ছেদবেদনার কান্না বাজে। স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়ার রাতগুলিতে কুমুকে বারবার আওড়াতে হয় দাদার কাছে শেখা মীরাবাঈয়ের গান, দিনগুলিতে মনে পড়ে তার কুমারী-বয়সে শোনা রামকেলী-কানাড়ার সুর। অলংকারের যৌতুক নিয়ে-আসা মধুসূদনের সামনে সে এসরাজের সুর বাঁধে, কেদারা থেকে পৌঁছয় ছায়ানটে, যে-সুর শুনে মধুসূদনের মতো গানহীন মানুষেরও মনে হয় হঠাৎ: এই তো আমার ঘরে

এসেছে, এ কী আশ্চর্য সত্য। স্বামীর ঘর থেকে ফিরে এসে বিপ্রদাসকে কুমু শোনাতে চায় গান, প্রবাসী ভাইকে নিয়ে সংকট ঘনিয়ে উঠবার মুহূর্তে কুমুর কাছে বিপ্রদাস শুনতে চায় এসরাজ, আবার যেদিন যাবার সময় হলো কুমুর, বিপ্রদাস বলে তাকে, 'নে যন্ত্রটা, আমরা দুজনে মিলে বাজাই', ভৈরোঁ রাগিণীতে আলাপ শুরু করে দু-জন। এই এসরাজও হয়ে ওঠে 'যোগাযোগে'র এক চরিত্র, রবীন্দ্রনাথের আর কোনো উপন্যাসেই সাংগীতিক আবহ এতটা পরতে-পরতে জড়ানো নেই।

কিন্তু এ-সুর কোথায় পৌঁছে দেবার জন্য? শেষ দিনের এই ভৈরোঁ আলাপের পর বিপ্রদাস বলেছিল তার এক ধর্মের কথা, কথায় বলতে গেলে যা ফুরিয়ে যায়, তবু যা আজ সে বলে কুমুকে : 'তুই মনে করিস আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলি নে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে; তাকে নাম দিতে পারি নে।' তখন আমাদের মনে পড়ে যে কেবল এই শেষ দিনেই নয়, এ উপন্যাসে যখনই সুরের কথা গানের কথা আসে, তখনই তার সঙ্গে আতত হয়ে আসে এক ধর্মেরও কথা। মীরার ভজন অথবা গীতার শ্লোক ভাবতে হয় কুমুর নিজেকে সংহত করে নেবার মুহূর্তগুলিতে, গানের মধ্য দিয়ে তার মুখে এসে লাগে এক অধ্যাত্মবিভা। যখনই সে বাজায় বা গায়, তার মনে হয় সমস্ত জীবন যেন ভরে গেল এক আলোয়; সেখানে সাংসারিক দুঃখ-অপমানের জায়গা নেই কোনো। সমস্ত সংকটমুহূর্তে সুরের মধ্যে যেন তার ধর্মীয় ত্রাণ মিলে যায়। কুমুকে বিপ্রদাস বলেছিল ধর্মের কথা, আর কুমু বলেছিল মোতির মাকে তার ধর্মের ছবি।

বলেছিল : 'আজ বুঝতে পেরেছি সংসারে ভালোবাসাটা উপরি পাওনা। ওটা বাদ দিয়েই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে সংসারসমুদ্রে ভাসতে হবে। ধর্ম যদি সরস হয়ে ফুল না দেয় ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হয়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।'

ধর্মও তাহলে এ-উপন্যাসের বড়ো এক প্রসঙ্গ, যদিও মনে হয় না যে কুমুর বলা ওই কথাগুলিতে পৌঁছে দেবার গরজেই 'যোগা-যোগ' লেখা। এ-ও নয় যে ঠিক এই ধর্মের কথাই অন্তিম পরিচ্ছেদে তার দাদার কাছে শুনতে পাবে কুমু। আঁকড়ে-ধরা এই শুকনো ধর্মে নয়, ভালোবাসার সঙ্গে মেলানো কোনো ধর্মেই যে পৌঁছতে হবে তাকে, এরই দ্বন্দ্ব নিয়ে এই উপন্যাস। প্রথম যৌবনে জেগে-ওঠা কুমুর যে অস্পষ্ট ভালোবাসার বোধ, তার কৌমার্যের স্বপ্ন, সেই বোধ সেই স্বপ্নই তো তাকে নিয়ে আসে এক আত্মিক ধারণায়, এক দেবতার কল্পনায়। প্রেমই তো পৌঁছতে চেয়েছিল তার পূজায়, তার পূজাই তো চেয়েছিল প্রেমে পৌঁছতে। কিন্তু সে যে ব্যর্থ হলো, তা' কেবল একজন্য নয় যে যথার্থ ভালোবাসা পেল না সে, তা বরং এইজন্যে যে ভালো বাসতেই পারল না সে। মোতির মাকে বলে-ছিল কুমু তার সমস্ত আবেগ দিয়ে : 'আজ দেখতে পাচ্ছি ভালো-বাসতে পারাটাই সবচেয়ে দুর্লভ, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় ঘটে।'

ভালোবাসতে পারা-না-পারার এই সমস্যাই 'যোগাযোগে'র কেন্দ্রীয় সমস্যা, কিন্তু সে-কথা বলবার জন্য এখানে কেবলই আসে ধর্মের কথা, আসে গানের কথা। সমীকরণের এই ধরনটা স্পষ্টই পেয়ে যাই তেতাল্লিশ পরিচ্ছেদের এই লাইনটিতে যখন কবি জানান : 'প্রথম যৌবনের সেই মরীচিকাই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কলকাতায় ওর পূজার মধ্যে, ওর গানের মধ্যে।' পূজা আর প্রেমের মধ্যে এক

সেতু তৈরি করতে চায় তার গান, তবু পারে না যে শেষ পর্যন্ত, এই নিয়েই 'যোগাযোগে'র কুমু।

২

যে-সেতুটি তৈরি করতে চেয়েছিল কুমু, কিন্তু পারেনি, তারই আয়োজন নিয়ে ভরে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান। বলা যায়, এখানেও প্রেম আর পূজার মধ্যে একটা যোগ তৈরি করছে 'গান'।

যেমন পূজার, যেমন প্রেমের, রবীন্দ্র-রচনায় তেমনি কয়েকটি আছে গানের গান। কিন্তু 'গীতবিতানে'র যে-পর্যায়ভাগ করেছিলেন কবি নিজে, সেখানে এমন কোনো বিভাগ নেই। বিভাগ নেই, তবে উপভাগ আছে একটা। 'পূজা' অংশে যে একুশটি উপশ্রেণীর কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার প্রথমটিই ছিল 'গান', 'পূজা'র প্রথম বত্রিশটি রচনাই কোনো-না-কোনোভাবে সুরের কথা বলে। এটা আমাদের মনে থাকে বটে, কিন্তু অনেক সময়ে আমরা লক্ষ করতে ভুলে যাই যে 'প্রেম' অংশেরও প্রথম গানগুলি ওই একই রকম গানের গান, এরও প্রথম সাতাশটি রচনায় তৈরি হয়ে উঠেছে সুরের প্রসঙ্গ, গড়ে উঠেছে 'গানের রত্নহার।'

এ কি আকস্মিক একেবারে যে এই দুই পর্যায়েরই প্রবেশক হিসেবে কবি সাজাতে চাইলেন এই গানের গানগুলি? না কি এর মধ্য দিয়ে, কুমুর মতোই, গানের পথে ধর্মে আর গানের পথে ভালোবাসায় পৌঁছবার এক সাধনা করেন কবি? ধর্ম যেমন মানুষকে তার অহংসীমার বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, ভালোবাসারও তো সেই কাজ। নিজেকে নিজের মধ্য থেকে মুক্তি দিতে পারি যখন, নিজেকে যখন যুক্ত করতে পারি পরিজন-

পরিবেশের মধ্যে, অনায়াস আনন্দে বা গভীর বেদনায়, সেই মুহূর্তই ভালোবাসার মুহূর্ত। ধর্ম আর ভালোবাসা এই যে চরিতার্থতা চায়, ভেঙে দিতে চায় নিজের আবরণ, সেইখানেই তো নিয়ে যেতে চায় গান, যে-গানের বিষয়ে বলা হয়েছিল 'চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে'। তাই, গানের গান হতে পারে এই দুই পর্যায়েরই যোগ্য প্রবেশক।

কিন্তু সে-কথা যদি মেনে নেওয়া যায়, তবুও আমাদের জিজ্ঞাসা মেটে না। এই দুই পর্যায়ে যে সুর বা গানের কথা সাজানো হলো, তার মধ্যে কি কোনো ভিন্ন চরিত্রের কল্পনা আছে? কয়েকটি গান এ-পর্যায়ে, কয়েকটি ও-পর্যায়ে, এই মাত্র? না কি দু-পর্যায়ের গানেও আছে কোনো প্রচ্ছন্ন ভিন্নতা?

এর একটা সহজ উত্তর হতে পারে এই যে 'পূজা'র বত্রিশটি গানের মধ্যে অন্তত কুড়িটি লেখা হয়েছিল ১৯২০ সালের আগে, আর 'প্রেমে'র সাতাশটি গানের মধ্যে বাইশটিই ওই সময়ের পর। কিন্তু 'পূজা'তেও আছে ১৯৩১ সালের গান, 'প্রেমে'রও সূচক-গানটি ১৮৯৫ সালেই লেখা: 'চিত্ত পিপাসিত রে'। আর তাছাড়া, নূতন এই 'গীতবিতানে' কোনো অর্থেই গণ্য করা হয়নি কালক্রম, ১৮৯৫-এর গানের পাশেই এখানে থাকতে পারে ১৯২১ (আমার মনের মাঝে যে গান বাজে), ১৯২২-এর (তোমার সুরের ধারা) পাশেই থাকতে পারে ১৯০৯ (তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী)। তাই সময়ের ক্রমিকতাই একমাত্র কথা নয়, এ-দুয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকা সম্ভব অন্য কোনো ভাবনায়।

বহুদিন আগে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর "গানের গান" প্রবন্ধে বলেছিলেন যে এই গানগুলিকে সাজানো চলে তিনটি পর্যায়ে:

গান-শোনা, গান-শোনানো আর গানের দেওয়া-নেওয়া। তাঁর মনে হয়েছিল 'পূজা' অংশে প্রধানত সেই সুরস্রষ্টার কথা আছে, বিশ্বলোক যাঁর রাগিণী। আর 'প্রেম' অংশের মধ্যে আছে দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ, বিরহমিলনের মধ্য দিয়ে গীতলীলা। কিন্তু তবুও একটা দ্বিধা ছিল অমিয় চক্রবর্তীর, হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে গানগুলিকে এইভাবে শনাক্ত করা সহজ নয় বড়ো, হয়তো তিনি 'পূজা' 'প্রেম' নামগুলিকেই অনেকটা প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন এই প্রভেদ-সূত্রের বর্ণনায়। তাই শেষ পর্যন্ত বলতে হয় তাঁকে: 'কিন্তু পূজা ও প্রেমের মধ্যে তো ছেদ নেই; কবির সংকলিত গীতবিতানে তাই লিরিকের মালা গাঁথা হয়েছে।'

তবে কি একটু অন্যভাবে ভাবব আমরা? নিজের অস্তিত্বের মধ্যে যখন মানুষ অনুভব করতে পারে সমস্ত বিশ্বের অভিঘাত, তখন সে হয়ে ওঠে গভীরতর অন্য এক মানুষ। অভিঘাতের এই সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ দেখেন সুরের উপমায়। এ-অভিঘাত কখনো তীব্র, কখনো মৃদু, আনন্দের কখনো, কখনো ব্যথার। এ-গানগুলিতে সুরেরও বর্ণনা তাই কখনো আগুন হয়ে আসে, কখনো ঝরনা, হোম কখনো, কখনো মালা। কিন্তু সব সময়েই সে সুর যোগ করছে একের সঙ্গে অন্যকে, আমির সঙ্গে এক তুমিকে। সে-যোগ কখনো আমার গানে, কখনো তোমার গানে।

এই তুমির বোধ যদি আত্মস্থ এক সম্পূর্ণতার বোধ, এরই সঙ্গে যুক্ত হবার পথ যদি হয় গান, তবে সে-গানে কখনো তুমি এগিয়ে আসে আমির দিকে, কখনো তুমির দিকে আমি। 'পূজা'র মধ্যে যে গানের গান, সেখানে তুমি-আমির এই বিন্যাস প্রায় সমান সমান। সেখানে 'তোমার সুরের ধারা ঝরে' 'তোমার সুর কাণ্ডন

রাতে জাগে', তুমিই সেখানে সুরের আগুন লাগায়, তোমার বীণা বাজে, কিন্তু ওরই সঙ্গে আবার 'আমার সুরে লাগে তোমার হাসি' 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে / তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।' বলা যায়, হয়তো এই সুর মেলানোর কাজ অনেকটা সম্পন্ন হয়ে এল 'প্রেম' পর্যায়ের গানের গানে, কেননা দু-একটি ছাড়া সেখানে সবক'টি গানেরই উৎসে আছে আমি। সেখানে, 'তোমায় গান শোনাব, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো।'

অমিয় চক্রবর্তী লিখেছিলেন, 'গান যেখানে ভক্তিরসে বিধৃত, কবির নিজের সংগীতও সেখানে পূজার পর্যায়ে স্থান পেয়েছে।' কিন্তু এই-যে জাগিয়ে রাখার গানটির কথা বলা হলো, এর মধ্যে যদি কোনো ভক্তিরস না থাকে, এ যদি হয় প্রেমেরই গান, এ যদি নন্দিনীকে শোনাতে চায় বিশু, তবে 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান' কেন হবে স্বতন্ত্রভাবে ভক্তিরসের, তা বোঝা যায় না ভালো। এ কোনো ভক্তির কথা নয়, এ হলো ব্যক্তির কথা, এ কেবল প্রকাশ-বেদনার কথা, যে-বেদনা সম্পূর্ণের সঙ্গে নিজের বিচ্ছেদকে প্রত্যক্ষ করে তোলে শুধু, যে-বেদনা এগিয়ে নিতে চায় সমস্তের সঙ্গে মিলনের দিকে। তারই এক নাম হতে পারে প্রেম, তারই এক নাম হতে পারে পূজা। এই অর্থেই গানের গানগুলি এক সহজ সেতু তৈরি করে রাখে পূজা আর প্রেমের মধ্যে, দুই জগতে বড়ো রকমের কোনো ভিন্নতা থাকে না আর।

৩

এ আমির আবরণ সহজে খলিত হয়ে যায়, যখন সমস্তের সঙ্গে আমি মিলি। সংসারের রূঢ় অপমান কুমুকে বিঁধছিল যখন, তখন সে ভুল

করে তার চারপাশে তৈরি করছিল আরো একটা আবরণ, যে-আবরণ 'নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয়।' উলটো করে বরং তার খুলে দেবারই কথা ছিল এই প্রচ্ছদ, কেননা যতই আমরা নিজের দিকে আসি, আসি ভালোবাসার দিকে, ততই আমি ছড়িয়ে পড়ি ছোটো এক আত্মগণ্ডির বাইরে। পুরুষ যখন নারীকে অথবা নারী যখন পুরুষকে ভাবতে পারে এই মুক্তি, নিজের কাছ থেকে নিজের মুক্তি, তখনই তার ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথের 'পূজা'র গান যেমন, তাঁর 'প্রেমে'রও গানও তেমনি এই মুক্তির গান।

এটা অবশ্য ঠিক যে এই দুই পর্যায়ের যে-কোনো গানকেই চিহ্নিত করা যায় না এমন মুক্তির গান হিসেবে। 'পূজা'য় আমরা এমন গানও পাব অনেক, যেখানে প্রশস্তি আছে কিন্তু নিবেদন নেই, যেখানে প্রণতি আছে কিন্তু উন্মোচন নেই। 'ওদের সাথে মেলাও যারা চরায় তোমার ধেনু' 'ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি' 'যিনি সকল কাজের কাজী' 'আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি' ধরনের গানগুলিতে কোনো আত্ম-আবিষ্কার নেই, আছে কেবল অর্চনা। এই পূজা তাই উপরস্তরের পূজা। প্রেমের গানেও তেমনি আছে উপরস্তরের প্রেম, যখন আমরা শুনি 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' বা 'যৌবনসরসী নীরে' বা এমন-কী 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা'র মতো গানগুলি। কিন্তু উপরের এই আবরণ যখন ছেড়ে দেয় গান, যখন 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' থেকে পৌঁছই 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমনি করে গাও'-এর দিকে, তখনই ওই দুই পর্যায় এক জায়গায় এসে মেলে। বলা যায়, তখন পূজা আর প্রেম এই দুই শ্রেণীর বাইরে যেন কল্পনা করে নেওয়া যায় তৃতীয় আরেকটি শ্রেণী, যাকে বলি ভালোবাসার গান। আত্ম-আবরণ মোচনের প্রবল

বেদনায় মথিত হয়ে উঠে এই গানগুলি দাবি করে আমাদের সমস্ত সত্তা, আর তখন মনে হয় এর চেয়ে বড়ো মন্থন, এর চেয়ে বড়ো প্যাশান বা বাসনার তাপ আর যেন নেই আমাদের অভিজ্ঞতায়। পুরুষ আর নারী পরস্পরকে নিয়েই এই তাপ; কিন্তু কেবলই পুরুষ আর নারী নয়। আমি আর আমার ভিতরে-বাইরে ব্যাপ্ত এক না-আমি, অর্থাৎ তুমি, এ-দুয়ের মধ্যে এক নিবিড় বেদনাসম্পর্ক জাগিয়ে তোলে গানের সেতু।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে গিয়ে যে তেইয়ার-দ্য-শার্দ্যাঁর কথা মনে পড়েছিল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর, সেই শার্দ্যাঁ বলে-ছিলেন: নিজেকে যদি বিশ্বপরিধিতে বাড়িয়ে না নেয় মানুষ, তবে সে আলিঙ্গন করতে পারে না তার প্রিয়াকে। আর বিশ্ব তো কেবলই জায়মান, কেবলই সঞ্চরমান, অপূর্ণ কেবলই, তাই ভালো-বাসার জন্য মানুষের সামনে পড়ে থাকে এক নিরন্তর আত্মনির্মাণ। এই নির্মাণের জন্য, শার্দ্যাঁও বলবেন, আমাদের আহ্বান করছে বিশ্বের এক সংগীত, জাগিয়ে তুলছে আমাদের ভিতরকার এক সুর। নারীর মধ্য দিয়েই পুরুষ তার ছিন্নতার গণ্ডি থেকে মুক্তি পায়, বলেছিলেন তিনি, ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন তাঁর 'পার্সোন্যালিটি'র প্রবন্ধগুলিতে। মুক্তি পায় বিশ্বের দিকে। রবীন্দ্র-নাথ যেমন দেখতে চান

> এ আমির আবরণ সহজে খলিত হয়ে যাক;
> চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
> ভেদ করি কুহেলিকা
> সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ।
> সর্বমানুষের মাঝে

এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।

ঠিক তেমনি এক আনন্দকিরণের কথা বলেন শার্দাঁ, নাম দেন তাকে ওমেগা, 'Omega, in which all things converge is reciprocally that from which all things radiate!' নিজের সত্তার স্বাতন্ত্র্য স্থির রেখেই এই ওমেগার সঙ্গে, এই বিকিরণের সঙ্গে মিলতে চাই আমরা, এরই নাম ভালোবাসা। শার্দাঁর কাছে ভালোবাসা ছিল তাই তিন শব্দের যোগ : নারী, পুরুষ আর ঈশ্বর। রবীন্দ্রনাথেরও কাছে ভালোবাসা তিন শব্দের যোগ : তুমি আমি আর গান—তোমার আমার বিরহের অন্তরালে কেবলই তার সেতু বেঁধে যায় যে-গান, প্রেমের নয় শুধু, ভালোবাসার গান।

একটি রক্তিম মরীচিকা

নিজের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা ধারণা ছিল এই যে, রঙ তাঁর চোখে পড়ে না, বিশেষ করে লালরঙ। খবরটা একটু আশ্চর্য করে দেয় আমাদের। শব্দ দিয়ে যে লালের আভা তৈরি করেন তিনি, সে-কথা যদি ছেড়েও দিই, তবু আমাদের চোখে লেগে থাকে তাঁর ছবির রঙ, যেখানে ছড়িয়ে আছে নানারকমের লাল, লালের প্রাচুর্য। অনেকে হয়তো মনে করতে পারবেন তাঁর আঁকা সেই ছবিটি, দু-হাত তুলে ধরা সেই নারীমূর্তি, যার দু-পাশ ঘিরে যেন নেচে উঠছে অবিরাম আগুনের হলকা। প্রথমে ভাবতে লোভ হয় যেন আগুন থেকে উঠে আসছেন কৃষ্ণা, বর্ণের বিন্যাসও যেন সেদিকে এক চকিত ইঙ্গিত, কিন্তু তার পরেই আবার সরে যায় সে-ভাবনা। কেননা এর দাহ যে কেবল দু-পাশের ওই আগুনরঙেই, তা নয়: এর আঁচ লেগেছে ওই নারীর সমস্ত আর্ত ভঙ্গিমায়, তার ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত দুই ব্যাকুল বাহুর ছন্দে, অসীম প্রত্যাশাময় তার চোখের মুখের রেখায়। তখন, একটু উলটোভাবে বরং মনে হতে পারে পুরুরবা-উর্বশীর আদল, ধরতে চাওয়া আর ধরতে না-পাওয়ার চিরন্তন সেই রক্তিম বেদনা। কেবল ওই মূর্তিটি নয়, লাভাস্রোতে ঢেলে দেওয়া সমস্ত ওই ছবিটিই যেন চলমান হয়ে উঠতে থাকে চোখের সামনে, কেবলই সরে যেতে থাকে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। গগনেন্দ্র-নাথের ঘোমটা-টানা নারীমূর্তির মতো কালোশাদায় আঁকা শান্ত রহস্য নয় এর, এর রহস্য আমাদের আঘাত করতে থাকে বাসনার

তীব্রতায়, যদিও সে-বাসনা যেন প্রতিদিনের জীবন থেকে অনেক-খানি সরানো। অবনীন্দ্রনাথ যে বলতেন রবিকাকার ছবি একটা ভল্‌কানিক ইরাপ্‌শনের মতো, সে-কথার এক তীব্র উদাহরণ এই ছবি। এর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কারও হঠাৎ মনে পড়তে পারে 'সানাই' থেকে পাওয়া এক শব্দগুচ্ছ, ছবিটির নাম দিতে ইচ্ছে করে : একটি রক্তিম মরীচিকা!

কিংবা, উলটো করেও বলা যায় কথাটাকে। বলা যায়, 'সানাই' বইতে ছোটো-ছোটো কয়েকটি কবিতা আছে গানের খুব কাছাকাছি, সেগুলি একসঙ্গে মিলিয়ে পড়তে গেলে কারও বুঝি মনে হতে পারে এই ছবিটির কথা। এ-কথা সবাই বলেন যে রবীন্দ্র-নাথের ছবি আর তাঁর কবিতা চলে ভিন্ন চালে, কবি নিজেও তা বলেছেন অনেক সময়ে। এ-কথা সত্যি যে কবিতায় তাঁর দাহকে লুকিয়ে নেবারই অভ্যাস করেন রবীন্দ্রনাথ, এমন-কী রানী চন্দের সঙ্গে কথাচ্ছলে এতটাও বলেছিলেন একবার : 'এঁরা কবিতায় এত ধরা দেয় কোন্ সাহসে?... কবিতার বিপদ হচ্ছে—আবার সুবিধেও আছে এই যে, ছন্দের ঘোমটা দিয়ে আড়াল করে একে রাখা যায়।' সেই আড়াল রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে তৈরি করেন যে, দাহও অবয়ব নেয় শমতার, চাপা পড়ে যায় অনেক গোপন ভল্‌ক্যানো। কিন্তু তবু, কখনো হঠাৎ যে সে-আবরণ খসে যায় না এমন নয়, কখনো-কখনো তাঁর ছবির জগৎ আর তাঁর রচনার জগৎ চলে আসতে পারে অনেকটা কাছাকাছি। অন্তত, 'সানাই'-এর এই কবিতাগুচ্ছ বোধহয় তাঁর ছবি থেকে খুব দূরে নেই আর।

এ-কথা বলার কারণ কেবল এই নয় যে এর কোনো-কোনো কবিতার মধ্যে থেকে গেছে রক্তিম বর্ণনা। এটা সত্যি যে উদাসীন

স্মৃতির উপর এখন তিনি রঙ দিতে চান 'বুকের লালিম রঙে রাঙানো' অথবা পাখির পাখায় দেখেন 'গত ফসলের পলাশের রাঙিমা,' কিংবা কায়াহীন স্বপ্ন মিলিয়ে যায় আর 'দূরপথে তার দীপশিখা' হয়ে ওঠে 'একটি রক্তিম মরীচিকা।' এ-কথা ঠিক যে অস্তরবির 'রঙিন রশ্মি' ছড়ানো থেকে যায় এর অনেকগুলি লেখায়, কিংবা কখনো দেখা দিতে থাকে অশোকের গুচ্ছ। কিন্তু বাইরের এই রঙে নয়, কবিতাগুলির সঙ্গে ছবির যোগ হতে থাকে এক ভিতরকার রঙে, হৃদয়ের এক ক্ষরণে। শব্দবাহুল্যহীন ছোটো এই রচনাগুলি যেন জ্বলে যাচ্ছে এক গূঢ় বাসনার তাপে, অপসৃত অতীতের এক প্রগাঢ় শোচনায়। প্রণয়স্মৃতি যে রবীন্দ্র-রচনায় এই প্রথম এল এমন নয়, কিন্তু সেই স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো এক অকৃতার্থতার বেদনা এতখানি আর ঘিরে ধরেনি তাঁকে, এইখানে যেমন। যেন এক অবয়বহীন প্রণয়ের মরীচিকা কেবলই দূরে-দূরে সরে যায়, এই বোধ লিপ্ত হয়ে আছে রচনাগুলির মধ্যে, 'মরীচিকা' শব্দটিরই ব্যবহার আছে একাধিক কবিতায়। কিন্তু ওরই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে, অপস্রিয়মাণ এই বাসনায় দাহকে তিনি আবার উত্তীর্ণ করে নেন এক প্রশমতায়, আত্মলোকে, ঊর্ধ্বমুখে।

এই কবিতাগুলি যখন লেখা হচ্ছিল, তারই নিকটকালে বসে (জুন ১৯৩৮) প্রবীণ ইয়েট্‌সকে লিখছিলেন তাঁর কবিবান্ধবী ডরোথি ওয়েলসলি : জীবনের ছন্দকে কবির চেয়ে সংগীতশিল্পীরাই বোঝেন ভালো। মানুষের গোটা জীবন জুড়ে আছে এক ছন্দ : তার জেগে থাকা তার ঘুমোনো তার ভালোবাসা অথবা সে-ভালো-বাসার অবসান, তার নিরাশা তার শান্তি, মৃত্যুকে তার বরণ করে নেওয়া, এই সমস্তটাকে মিলিয়ে কি একটা বৃত্ত তৈরি করিতে পারেন

কবিরা? 'Perhaps they are too passionate' ভেবেছিলেন ডরোথি। সত্যি কি তাই? অন্তত এইখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এমন একজন কবিকে যাঁর সঙ্গে মিলেই আছেন এক সংগীতশিল্পী, যাঁর শেষ জীবনের এই কবিতাগীতির মধ্যেও দেখা দিচ্ছে এক সমগ্রের ছন্দ, একই সঙ্গে বাসনার স্মৃতি উত্তাপ আর তার ঊর্ধ্বায়ন —ডরোথি তাঁর প্রত্যাশিত বৃত্ত হয়তো এরই মধ্যে পেয়ে যেতে পারতেন।

একদিন কেউ এসেছিল কাছে, দিনে অথবা রাতে, কিন্তু তার যোগ্য আসন যেন ছিল না মনে। ঘাসে-ঘাসে উদাসীন বেদনা মেলে দিয়ে ফিরে গেল সে, চুল থেকে খসে পড়ল কেবল অশোক। না কি ছিল বৃষ্টিদিনের কদম ফুল, আর বিনিময়ে তাকে দেওয়া হয়েছিল মেঘমল্লার গান? কিন্তু আজ শুধু আছে স্বপ্ন, আর গানের সুরে সেই স্বপ্নকে ফিরে পাবার অথবা স্বপ্নচারিণীকে বুঝতে না পারার বেদনা, আজ 'স্মৃতিবন্যার উছল প্লাবন' অথবা 'স্মৃতির ডালায়' মালা গাঁথা, আর তার পর, 'স্মৃতির পত্র হতে' অতীতদিনের বাণী রেখায়-রেখায় মুছে নেওয়া। কিন্তু এখানেই কি শেষ হয়ে এল?' এ-গান কি কেবলই সেই 'ক্ষীণতার উদাসীন স্মৃতি'কে লক্ষ ক'রে? না, আবার এর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আসছে মন :

যে গান আমি গাই
জানি নে সে
কার উদ্দেশে।

এইবার, এইখানে, রবীন্দ্রনাথের অতি-পরিচিত এক কণ্ঠস্বরে এসে পৌঁছলাম আমরা। এই কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটা পরিমণ্ডল আছে, যার প্রভাবে অনেক সময়ে আমাদের ইচ্ছে হয়

স্পষ্ট একটি নারীমূর্তিকে এর মধ্য দিয়ে চিনে নিতে, এই রচনাকে মিলিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় তাঁর জীবনতথ্যের সঙ্গে। সন্দেহ নেই যে, কোনো অভিজ্ঞতাই আছে এর সঙ্গে জড়ানো, কিন্তু সে-অভিজ্ঞতা থেকে সরল চালে এই বেদনার উদ্‌ভব বলে ভাবলে খুবই ভুল করব নিশ্চয়। এই শেষ বয়সে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯) অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখছিলেন কবি : 'আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরি করেছি, ভৈরবী রাগিণীতে—জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা / হে গরবিনী। এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারম্বার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে, এই বারম্বারের অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলংকার।' তা হলে আবার এসে পৌঁছল সেই দূরত্বের কথা, সুরের মধ্য দিয়ে মেলে যে দূরতা। এই 'গরবিনী' নতুন কোনো উপলব্ধি নয় আজ, অনেকদিন আগে 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় 'বিদেশিনী' শব্দের এই একই অনুভব জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রত্যক্ষ একটি ভূমিকা কীভাবে ক্রমে তুলে নেয় দূরত্বের মণ্ডল, তার একটি সুন্দর উদাহরণ ধরা আছে 'সানাই'-এর অন্য একটি কবিতারচনার ইতিহাসে, সেখানে দেখা যায় ছুটির কর্ণধার এক তরুণী কীভাবে পালাবদল করে গড়ে ওঠেন 'ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার'-এর রূপে। 'সানাই'-এর ছোটো কবিতাগুলিও তার বাস্তব সুখদুঃখের সঙ্গে পেয়ে যায় এই দূরত্বের যোগ, যখন আমরা শুনি

'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
এতদিন তারে বুঝিতে পারি নি'

অথবা

'ঐ মুখে চেয়ে দেখি
　　জানি নে তুমিই সে কি'
'নিমেষঘেরা বাঁধন হতে
　　টানে অসীম কালে'
'হৃদয় আমার অদৃশ্যে যায় চলে'
'তবু কে যে জানি নাই তারে'

আর শেষ পর্যন্ত

'অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে
　　এ মোর ছন্দোবন্ধনে।'

একই দিনে পাশাপাশি তৈরি এই কাব্যরূপ :

'সব চাওয়া ও যে দিতে চায় নিঃশেষে
　　অতলে জলাঞ্জলি'

আর

'তব যৌবন-উৎসবে ও যে
　　গানে-গানে দেয় সাড়া।'

অতল থেকে আকাশ পর্যন্ত এইভাবে উৎসারিত হয়ে ওঠে একটি বাসনাময় সেতু, বিদেশী এক কবি হার্ট ক্রেন যাকে দেখে হয়তো বলতে পারতেন : One song, one bridge of fire!

২

কিন্তু এটা কেমন করে হলো যে এই আগুনের সেতু এসে পৌঁছল একেবারে তাঁর অন্তিম জীবনে? এর উত্তর পাওয়া সহজ নয়। অথবা বলা যায় যে এরও উত্তর লুকোনো আছে ছবি আর গান বিষয়ে তাঁর ধারণার মধ্যে। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন

যে তাঁর ছবির মধ্যে আছে 'মাৎলামি করবার অবিমিশ্র স্বাধীনতা', খ্যাতির জগতের বাইরে তার বসবাস। আজ এই শেষ বয়সে যখন বাক্যের সৃষ্টির উপর তাঁর সংশয় জন্মে গেছে, তখন পালাবার জায়গা আছে তাঁর গান, আর তাঁর ছবি। গানের মধ্যে মুক্তি সব সময়েই খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু এত সচেতনভাবে পালাবার জায়গা বলে তাকে অনুভব করেননি আগে, এমন করে আর বলতে হয়নি আগে যে 'এই টলমলে অবস্থায় এখন দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের—গান আর ছবি।' একদিন যৌবনে কবিতার মধ্যে তিনি মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন ছবি ও গান, একটু ভিন্ন অর্থে; আর আজ কবিতার অথবা বাক্যবন্ধের প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়াল যেন ছবি আর গান, আর একই বিষয়ের প্রতিস্পর্ধী বলে তাদের মধ্যে যেন তৈরি হলো সহজ একটা বোঝাপড়া। বাক্যের সৃষ্টি যদি তাঁকে বেঁধে রাখে পরিচিত সংসারের খ্যাতিতে, তা হলে চলতি বাজারদর থেকে কবিকে সরিয়ে আনছে ছবি আর গান। তার মধ্যে এবার আমরা আশা করতে পারি অবচেতনের আবির্ভাব, যেমন-খুশির খেলা, বিশেষত ১৯৩৭ সালের 'মৃত্যুগুহা'র অভিজ্ঞতার পর থেকে, কালো কালিন্দীর স্রোত বেয়ে ভাসমান দেহটিকে দেখে নেবার পর থেকে, সেখানে এবার দেখা দিতে পারে এক নতুন দেশ।

অথচ, এতক্ষণ তো আমরা 'সানাই'-এর কবিতাগুলির কথাই বলছিলাম? কবিতা যদি ছবি ও গানের প্রতিস্পর্ধী, তা হলে এই রচনাগুলির মধ্যে কীভাবে সম্ভব হলো এই অগ্নিময় বাসনার সেতু? তখন আমাদের মনে পড়ে যে লক্ষিত এই কবিতাগুলির মধ্যে একটি-দুটি ছাড়া আর কোনোটিই মূলত কবিতা নয়, গান থেকেই এর

আবির্ভাব। রচিত কবিতাকে পরে সুরে বসিয়েছেন, রবীন্দ্র-রচনায় এমন উদাহরণ অবিরল। কিন্তু খুবই বিরল এই অভিজ্ঞতা যে, অল্প ক'দিন আগের লেখা গানকেই কবিতার পোশাক পরাচ্ছেন তিনি, সামান্য-কিছু শব্দছন্দের বদল ক'রে। সেই বিরল ব্যাপারটিই ঘটল এখানে মুহুর্মুহু, 'সানাই'-এর এই কবিতাগুচ্ছে।

বদলে নেবার সূত্রটি খুব জটিল নয়। রবীন্দ্র-সংগীতের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে আমরা লক্ষ করব, পরিমিত কাব্যছন্দকে সরিয়ে নিচ্ছেন তিনি গানের শরীর থেকে, তাকে দিচ্ছেন মুক্তছন্দ বা গদ্য-ছন্দের স্বাধীনতা। নবীন এই গানের গুচ্ছেও দেখি তার উদাহরণ, এর চরণগুলি টলমল করছে ছন্দের কাছাকাছি এসে, একটি-দুটি শব্দের বর্জন বা পুনর্বিন্যাসেই হয়তো হয়ে উঠতে পারে পুরোমাপের ছন্দ, কিন্তু সেই একটি-দুটিকে আলতোভাবে সরিয়ে রাখছেন কবি। 'সানাই'-এর কবিতাগুলির মধ্যে যখন আবির্ভাব হলো ওই একই রচনাবলীর, তখন আমরা দেখছি কেবল সেই বর্জন বা পুনর্বিন্যাস, সুষম ছন্দের মধ্যে তাকে ধরে দেওয়া, কবির অভিপ্রেত অর্থকে একটু পালটে নিয়ে যেন বলা যায় যে এইবার 'অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে এ মোর ছন্দোবন্ধনে!' সুরের সাহায্য পাবে না জেনেই যেন এ ছন্দের নির্ভর নিতে চাওয়া। সুর নেই বলেই, গানে যদি থাকে

নামিল শ্রাবণসন্ধ্যা, কালো ছায়া ঘনায়
বনে বনে,

কবিতায় তবে সে আসে ছ-মাত্রার সহজ চালে: 'নামিল শ্রাবণ / কালো ছায়া তার / ঘনাইছে বনে / বনে'; গান যদি দেখে 'তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল', কবিতায় তবে পাই 'পাতায়

পাতায় / ফোঁটা ফোঁটা ঝরে / জল' ; গানের 'ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায় / পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি', কবিতায় হয়ে যায় 'শুধু কুণ্ঠিত / বিশীর্ণ ধারা / তীরের প্রান্তে / জাগাল পিয়াসি / মন'।

'সানাই' বইটির যে তেইশটি কবিতার গীতরূপ আছে, তার বারোটিরই রচনাকাল দেখতে পাই : জানুয়ারি ১৯৪০। এরও মধ্যে আবার আটটি তৈরি হয়েছিল দু-দিনে, দশ আর তেরো তারিখে। জানতে কৌতূহল হয়, কী ঘটছিল ওই সময়ে। কেন হঠাৎ রচিত ক'টি গান নিয়ে বসেছিলেন আবার? বছরখানেক আগে ব্যস্ত ছিলেন নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা' নিয়ে, লিখতে হয়েছিল তার জন্য নতুন কুড়িটি গান, দুর্ভাবনা ছিল 'পুরোনো হাতের সঙ্গে নতুন হাতের বুনোনি মিলছে কিনা' এই নিয়ে। অল্প ক'দিন আগে মিটে গেছে নন্দিনীর বিয়ে, আর সেই উপলক্ষে দু-তিনটি নতুন গানের চর্চা। তারপর? তারপর হয়তো ইন্দিরা দেবীর নতুন ফরমায়েশ ছিল কিছু, কিন্তু কবির মনে হচ্ছে আর সম্ভব নয়। যে দশ তারিখে পুরোনো ক'টি গানের কবিতারূপ তৈরি করছেন তিনি, সে-দিন খানিকটা যেন দীর্ঘশ্বাস নিয়েই প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ : 'বিবির একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে আমার শক্তি পূর্বের মতোই অক্ষুণ্ণ আছে। এখন যেটুকু বাকি আছে সে ফাটলধরা ও কানাভাঙা। বিবি যদি সামনে উপস্থিত থেকে চেপে ধরত তা হলে হয়তো অগত্যা গুন গুন করতে করতে কিছু আর্তধ্বনি বেরোত। আজকাল আমি গানের অন্তরাটা ভাঁজতে ভাঁজতে আস্থায়ীটা ভুলে যাই—কাউকে সামনে বসিয়ে সুর দিতে হয়। এরকম কৃচ্ছ্রসাধন ইচ্ছে করে কি চালানো যায়।' তাই, বিবি যখন

সামনে নেই, তখন হয়তো গানের দিকে কেবল ফিরে তাকানো যায় অভিমানীর চোখে, তাকে নিয়ে খেলা করতে ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ, তাকে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করে কবিতার চেহারায়।

স্বভাবতই, এ-কবিতা গানের খুব কাছাকাছি। হয়তো তাই এ-কবিতার সঙ্গে অন্য কবিতার—এমন-কী সমকালীন কবিতার ব্যবধান ঘটে যায় অনেক সময়ে। হয়তো এই কবিতাগুলির মধ্যেই প্রশ্রয় পায় তাঁর সেই অভ্যন্তরীণ বোধ যে, অনেক কথা বলার মানে নেই কবিতায়। কবিতা যে বুঝিয়ে বলবার নয়, এই শেষ বয়সে আবার সে-কথা স্পষ্ট করে বুঝতে চাইছিলেন কবি, "প্রজাপতি" নামের দীর্ঘ কবিতাটি পাঠিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন (১০. ৩. ৩৯) অমিয় চক্রবর্তীকে, 'এই দ্বিতীয় সংস্করণটাকে কি বাহুল্য-দোষে পেয়ে বসেছে ? হয়তো এসব জিনিস একটু কম বোঝানোই ভালো—কারণ এর ধর্মই হচ্ছে স্পষ্ট না বোঝানো।' কিন্তু তবু, কেবল "প্রজাপতি"তেই নয়, ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে যে-কবিতাগুলি লিখছিলেন তিনি, তার বৈশিষ্ট্যই হলো এই ছড়িয়ে বলা, এই বুঝিয়ে বলা। দ্বিধার, কুণ্ঠার কি তাহলে ফল ছিল না কোনো ? দশ বা তেরো তারিখের ছোটো রচনাগুলিতে যা আছে, স্মৃতিবেদনার যে-তীক্ষ্ণতা, অবসানের যে সমূল ছায়াপাত, তারই অনুভব আছে এগারো বা বারো তারিখের বিস্তারিত কবিতা-বলীতে। বিস্তারিত, অতএব একটু-বা শিথিল। এটা লক্ষ করবার বিষয় যে "শেষবেলা" (১১. ১. ৪০) বা "শেষ দৃষ্টি" (১২. ১. ৪০) নামের সেই কবিতাগুলির জায়গা হলো 'সানাই'তে নয়, 'নবজাতকে'। এটা লক্ষ করবার বিষয় যে, 'ভালোবাসা এসেছিল এমন সে নিঃশব্দ চরণে' রচনাটি যে-দিন তৈরি হচ্ছে নিভৃতে, সেই

দিনই (২৮. ৩. ৪০) তাঁর প্রকাশ্য 'জবাবদিহি' : 'কবি হয়ে দোল উৎসবে / কোন্ লাজে কালো সাজে আসি / এ নিয়ে রসিকা তোরা সবে / করেছিলি খুব হাসাহাসি' কিংবা "রাতের গাড়ি" কিংবা তার আগের দিনের লেখা 'আজি ফাল্গুনে দোল পূর্ণিমা রাত্রি / উপছায়া-চলা বনে বনে মন / আবছাপথের যাত্রী।' বলা দরকার যে এই সবক'টি রচনাই গৃহীত হচ্ছে 'নবজাতক' কাব্যে, সমকালীন আবছা-পথের মূল আশ্রয় ছিল 'সানাই'।

গানকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন ethereal, মনে করে-ছিলেন 'যখন ভালোবাসার গান গাই তখন পাই শুধু গানের আনন্দকেই না : ভালোবাসার উপলব্ধিকেও মেলে এমন এক নতুন নৈশ্চিত্ত্যের মধ্য দিয়ে যে, মন বলে পেয়েছি তাকে যে অধরা, যে অলোকবাসী, যে কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে।' জীবনের শেষ দু-তিন বছরে, গলা থেকে এই সুরের সামর্থ্য সরে যেতে চাইছে যখন, তখন তাঁর কবিতাকেও তিনি আনতে চাইলেন অধরা গানের খুব কাছাকাছি, কবিতার শরীরও হয়ে উঠতে লাগল এক 'দিব্য কার্পণ্য-গুণে' ভরা, রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে আর 'শেষ লেখা'র রচনাগুলির পূর্ব-ভূমিকা এইভাবে তৈরি হতে লাগল 'সানাই' বইটির মধ্যে, যেখানে আক্ষরিকভাবেই গান আর কবিতা মিশে গেছে একে অন্যের সঙ্গে, যেখানে কথার মধ্যে কেবলই জ্বলছে সঞ্চরমাণ এক সুর।

কবিতা হয়ে উঠতে চায় গানের মতো ছোটো সরল নির্ভার, কখনো-কখনো এমন-কী সুরে-বসাবারও যোগ্য, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইতিহাসে এমন মুহূর্ত আমরা দেখতে পাব দু-বার। আবার উলটো দিক থেকে, যদি লক্ষ করি তাঁর গানের ইতিহাস, আমরা দেখব যে তাঁর গানও এগিয়ে যেতে চায় কবিতার দিকে, সুরবিহীনভাবেও সে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চায় শব্দে ছন্দে প্রতিমায়। এ দুয়ের মধ্যে যে কোনো বিরোধ আছে তা অবশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন এমন এক বিন্দু যেখানে এসে এ দুই শিল্পরূপ একটা মিলনের সামঞ্জস্য পায়, যেখানে কবিতার ভিতরে থাকে সুরের খেলা আর গান হয়ে ওঠে কবিতাময়। কুড়ি বছর বয়সের "সংগীত ও কবিতা" প্রবন্ধে লিখেছিলেন তিনি : 'কবিতা আর গানে কোনো প্রভেদ নেই, 'কেবল ইহা ভাবপ্রকাশের একটা উপায়, উহা ভাব-প্রকাশের আর-একটা উপায় মাত্র।' এই উপায়দুটির মধ্যে কবিতা আছে উঁচু শ্রেণীতে আর গান নিচু, কেননা গানে সূক্ষ্মস্থূল সমস্ত ভাব প্রকাশ করা যায় না এখনো, ম্যাথু আর্নল্ডের অনুসরণে এই ছিল তাঁর আক্ষেপ। এই আক্ষেপের বেদনা ভিতরে-ভিতরে ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের গানের ইতিহাস হয়ে ওঠে গান-আর-কবিতায় ওই শ্রেণীবিলোপের ইতিহাস, কবিতার মতো গানের ভাষাতেও তিনি ধরতে চান আমাদের সূক্ষ্মজটিল বিচিত্রতম বেদনার জগৎ, দেখতে চান তার 'কত দিকে কত বাণী'।

৯

"সংগীত ও কবিতা" প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন কবি : 'মনে করো এমন যদি নিয়ম হইত যে, যে কবিতায় চতুর্দশ ছত্রের মধ্যে বসন্ত মলয়ানিল কোকিল সুধাকর রজনীগন্ধা টগর ও দুরন্ত এই কয়েকটি শব্দ বিশেষ শৃঙ্খলা-অনুসারে পাঁচবার করিয়া বসিবে তাহারই নাম হইবে "কবিতা বসন্ত" ও যদি কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ কবিদিগকে ফর্মাশ করিতেন ওহে চণ্ডিদাস, একটা কবিতা বসন্ত আওড়াও তো, অমনি যদি চণ্ডিদাস আওড়াইতেন

বসন্ত মলয়ানিল রজনীগন্ধা কোকিল
দুরন্ত টগর সুধাকর
মলয়ানিল বসন্ত রজনীগন্ধা দুরন্ত
সুধাকর কোকিল টগর।

ও চারিদিক হইতে আহা আহা পড়িয়া যাইত, কারণ কথাগুলি ঠিক নিয়মানুসারে বসানো হইয়াছে—তাহা হইলে কবিতা আধুনিক গানের মতো হইত।'

গানের শব্দ নিয়ে নয় অবশ্য, এই কথাগুলি তরুণ কবিকে বলতে হচ্ছিল গানের রাগরাগিণীর প্রকৃতি নিয়ে। গানের ক্ষেত্রেও রাগিণী একটি আবহ তৈরি করে মাত্র, সেইখানেই তার পূর্ণ পরিচয় নয়, তারও পরে আছে তার ছবি আর ভাবের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবি, এই কথা ভাবছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর এই ভাবনার মধ্য দিয়ে, বোঝা যায়, তরুণ কবি নির্বাচন করে নিতে চাইছেন তাঁর নিজের পথ, আশা করছেন যে, 'প্রত্যেক গীতিকবির রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হইতে থাকিবে।'

কবিতাবসন্তের ওই লাইনক'টি নিশ্চয়ই পরিহাসজড়িত, কিন্তু

তবু এর বর্ণনা থেকে আমাদের মনে পড়ে যায় সেদিনকার বাংলা প্রেমের গানের শব্দদীনতার বা ভাবদীনতার কথা। জানি না ওই শ্লোকটি রচনার সময়ে কবির মনে পড়ছিল কি না নিধুবাবুর এইসব গানেরই ভাষা :

বিরহী বধিতে আইল প্রবল বসন্ত।
প্রাণ দহে, স্থির নহে, বিনে প্রাণকান্ত॥
ফুল বিকশিত, কোকিল কূজিত, মলয়া দুরন্ত।

কেবল বসন্ত কোকিল মলয় দুরন্ত শব্দগুলি এখানে আছে বলেই নয়, একটির পর একটি গান তুলে নিলে দেখা যাবে এ-রকমই প্রথাগত সামান্য কয়েকটি শব্দের পরম্পরা সাজিয়ে গানের পর গান তৈরি করতে পারেন নিধুবাবু বা তাঁর অনুরাগীরা। এ-গানটি যদি হয় ভীমপলাশী বাহারে, তাহলে আড়ানা বাহারে লিখতে পারেন তিনি :

বিরহ যাতনা সখী রে অতি বিষম হইল।
আইল বসন্ত।
কুসুম সৌরভ, কোকিলের রব সহে না
ও রব নিতান্ত॥
দিবাকর সুধাকর সম মম মনে
জলায় জীবন মন্দ মলয়া পবনে।

'দুরন্ত' এখানে নেই বটে, তার জায়গা নিয়েছে 'সুধাকর'।

শব্দের ক্লান্তিময় পুনরাবর্তন ছাড়াও অন্য একটা প্রশ্ন নিশ্চয় ছিল কবির মনে। এই অল্প কয়েকটি শব্দের পিছনে কি কোনো অভিজ্ঞতার সত্য আছে, না কি শব্দগুলি উঠে আসে কেবল রীতি হিসেবেই? প্রায় একই সময়ে 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' বইটিতে

লিখছিলেন তিনি : 'দেশে যদি আমার কাজ থাকত তাহলে আজ হয়তো এই দুরন্ত বসন্তে একান্ত প্রাণান্ত ও অন্ত-অক্ষর-বিশিষ্ট আরও অসংখ্য ঘটনা ঘটত। এ দেশে বসন্ত বলে বাস্তবিক একটা পদার্থ আছে। আমাদের দেশে বসন্ত নেই, কেবল বসন্ত বসন্ত বসন্ত করে বিরহীগুলো ভারি গোলমাল করে—বলে, মলয় বাতাসে তাদের গা দগ্ধ হয়।'

পুরোনো দিনের এই অনুপলব্ধ শব্দের ভার আর আজকের দিনের গানের ভাষায় শব্দগত অত্যাচার, এ দুয়ের মাঝখানে রবীন্দ্র-নাথের প্রেমের গানে অল্প সময়ের জন্য আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম সেই শব্দ, যা মানুষকে তার আত্মপরিচয় জানায়, তার সমস্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবার শক্তি দেয়। শব্দ কীভাবে আমাদের আপন সময়ের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের গানে তার চিহ্ন আছে ছড়ানো। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও ঠিক যে এ-চিহ্ন একদিনেই অর্জন করেননি তিনি, এরও জন্য তাঁর শিল্পীজীবনের ইতিহাসে দরকার হয়েছিল এক দীর্ঘ পরিক্রমার। কবিতাবসন্তের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া এই পরিহাসের একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু পরিহাসের সেই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কি প্রচলিত অভ্যাসের দায় থেকে মুক্ত ছিলেন একেবারেই ? কোনোই কি পিছুটান ছিল না তাঁর ?

'গীতবিতানে'র গানগুলি আজ আর কালানুক্রমে সাজানো নেই। ধরা যাক, 'প্রেম' বিভাগে প্রায় চারশোটি গান যে পরপর আসে ওখানে, সে কেবল কোনো-না-কোনো অর্থে ভালোবাসার কথা আছে বলেই, ভাবা হয়নি সেখানে অন্য কোনো পরম্পরার কথা। তবু, অসম্ভব নয় যে প্রায়ই এই গানগুলির ভাষা-ব্যবহার

থেকে পাঠক অনুমান করে নিতে পারবেন এর কোনো-কোনো রচনার কাল। 'বনে এমন ফুল ফুটেছে / মান করে থাকা আজ কি সাজে' এর একটি গান পরেই পাব 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমনি করে গাও গো', আবার এর একটি পরেই 'বলো দেখি, সখী লো, নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লো।' পুরো গানগুলি না দেখেও, কেবল এই দু-একটি লাইনে শব্দের ভঙ্গি আর ভাবের ইঙ্গিত লক্ষ করেই আমাদের সন্দেহ হতে পারে যে বিস্তর এদের সময়ের ব্যবধান। মিলিয়ে নিলে দেখা যাবে সন্দেহটা মিথ্যে নয়, প্রথমটি কবির বাইশ বছরের রচনা, তৃতীয়টি কুড়ি, আর মাঝখানেরটি—অভ্রান্তভাবেই—গীতাঞ্জলি-পর্বের গান।

কোকিল বা মলয়, সমীরণ বা বসন্ত, রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম যৌবনের গানে ফিরে আসে কেবলই। পরাণ হৃদয় সুখ দুঃখ উদাস সোহাগ স্বপন, এই ছিল সে-গানের প্রধান বিষয়; আর তার উদ্দীপনে ছিল কানন কুসুম তরুলতা কুঞ্জবন, ছিল সমীর শিশির অলি বা নলিনী; বেজে ওঠে শুধু বাঁশি বা বাঁশরি; সম্বোধনে কেবলই সখী। বুঝতে বাকি থাকে না যে কেবল 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তেই নয়, অন্য প্রেমের গানেও কবি ব্যবহার করছিলেন অভ্যস্ত বৈষ্ণব কবিতার পরিবেশ, প্রেমের অনুষঙ্গ তাঁর কাছে অব্যাহতভাবে নিয়ে আসছিল রাধারই ছবি, 'মানসী'র কবিতায় সহজেই বলতে পারছিলেন তাই: 'এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে।' 'দুজনে দেখা হলো মধু-যামিনীতে' গানের শেষ লাইন তাই হতে পারে 'চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে', যে-যমুনা প্রায়ই পট তৈরি করে তাঁর গানের। 'বঁধু তোমায় করব রাজা'য় হয়তো আশাই করা যায় যে শুনতে পাব 'বনফুলের বিনোদমালা'র কথা,

কিন্তু 'মায়ার খেলা'র সখীরাও যখন আধুনিক নায়ককে নিয়ে বলতে পারে 'ওই যে তরুতলে বিনোদমালা গলে / না জানি কোন ছলে বসে রয়েছে', তখন বুঝতে পারি কতটাই পুরোনো টান বেঁচে আছে তখনো রবীন্দ্রনাথের গানে।

অবশ্য, এমন নয় যে এই পিছুটানই এ-পর্বের গানের একমাত্র পরিচয়। তাঁর প্রেমের গানও যে পৌঁছবে কোনো এক আত্মিক প্রসারের জগতে, তার ইঙ্গিতও শুরু হয়ে যায় এই প্রাথমিক চর্চাতেই। 'চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে' হয়তো ভাবতে পারতেন নিধুবাবুও, কিন্তু তার ঠিক আগেই কবি বলে রাখেন 'আর তো হলো না দেখা, জগতে দোঁহে একা', যে একার উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথই জাগিয়ে তুলবেন তাঁর বাংলা গানে। এটা ঠিক যে 'মায়ার খেলা'তেই ভেসে এল সেই তরণীটিরও ছবি, 'মায়ার তরণী' বা 'সোনার তরণী', যার উপর ভর করে কেন্দ্র থেকে দিগন্ত পর্যন্ত যাওয়া-আসা চলবে কেবলই। আধুনিক একটা বেদনাকেই সেদিন ধরতে চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু আমাদের সামাজিক বা পারিবারিক অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রশ্রয় ছিল না তেমন-কোনো সম্ভাব্য ছবির, তাই তাঁকে ধরতে হচ্ছিল রাধার রূপ বা রূপক। এ-রূপের আভাস বহুদিন পর্যন্ত থেকে যাবে তাঁর গানে, থেকে যাবে বাঁশি বা বর্ষার পরিসর, থেকে যাবে এক পথিক প্রেমিকের কল্পনা, থেকে যাবে 'ছিন্নপত্রাবলী'র এই স্বীকারোক্তি যে 'প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণব কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়।' কিন্তু বিশেষ এই ঝংকার থেকে, এ-রূপের বহিরবয়ব ভেঙে একদিন বেরিয়ে আসবে রবীন্দ্রনাথের গানের সেই নিজস্ব হাহাস্বর : হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা।

বলা যায়, পদ্মার দিনগুলিতে প্রথম তিনি বেরিয়ে আসবেন

এই স্বগত উন্মোচনের দিকে, বাঁশির সঙ্গে যখন বেজে উঠবে নূতন এক বীণা, যে-বীণা বাঁশির চেয়ে বড়ো এক বিশ্বপরিধি পায়। বাঁশি কেবল ভালোবাসার টান, আর বীণা যেন বাজিয়ে তুলতে চায় ব্যাপ্ততর গভীরতর কোনো সর্বাত্মক বেদনা। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র (১৮৮১) সরস্বতী বলেছিলেন বটে 'এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার', কিন্তু তারও আগে কিশোর বয়সের অল্প দু-একটি ভারতসংগীত ছাড়া এ-বীণাটিকে আমরা দেখতে পাব না তাঁর গানে অনেকদিন পর্যন্ত। পদ্মায়, 'চিত্রা'র কবিতাগুলির সমকালে (১৮৯৪-৯৫) হঠাৎ বেজে উঠবে এক বীণা, একের পর এক লেখা হবে 'বাজিল কাহার বীণা' 'আমারে করো তোমার বীণা', 'বিশ্ববীণারবে' 'থাক বীণা বেণু মালতী মালিকা (এসো গো নূতন জীবন)' বা 'নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি (মধুর মধুর ধ্বনি বাজে)'। এখন আর এ-বীণা কেবল বাইরের উদ্দীপনা নয়, এখন—'ছিন্নপত্রাবলী'তে এ-সময়েই যেমন লিখছেন তিনি—'বীণার তার যখন বাজতে থাকে তখন সেটা যেমন আবছায়া দেখতে হয়, গানের সুরে সমস্ত জগৎটা সেই রকম বাষ্পময় এবং ঝংকারপূর্ণ হয়ে ওঠে।' এ হলো সেই সময়, যখন 'বাজিল কাহার বীণা' গানটির মধ্যে আমরা পাব 'পরানের আবরণ মোচন করে'র মতো উচ্চারণ। এই হলো সেই সময়, যখন 'আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে' 'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি' 'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে' 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম' অথবা 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ'র মতো নিবেদনময় গানগুলি পরপর লিখবেন কবি। এই হলো সেই সময়, যখন ইন্দিরা দেবীকে লিখবেন তিনি, আমাদের রাগিণীতে আছে পৃথিবীর অসীম ঔদাস্যের

আবিষ্কার, বিশ্বব্যাপী এক অশ্রুবাষ্পের ছায়া। 'বড়ো বেদনার মতো' গানটি বিষয়ে যা লিখেছিলেন তিনি চিঠিতে, তা হয়তো এর সব-ক'টি গান বিষয়েই সত্য হয়ে উঠবে যে 'এসব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো।' যখন তিনি বলেন 'প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না', তখন সে-প্রকৃতি কেবল বাইরের পরিবেশ হয়ে থাকে না আর, সে হয়ে ওঠে 'তার ভিতরকার নিত্য নূতন আবেগ, অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা' যা কেবল গানের সুরে প্রকাশ পায়। এই নিরালার সঙ্গে, প্রাকৃতিক এই নির্যাসের সঙ্গে, এই বিরহবেদনার সঙ্গে যখন যুক্ত হয়ে যায় ব্যক্তিগত ভালো-বাসা, তখনই রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান তার নিজের মহিমায় জেগে ওঠে, যে-মহিমায়—'ছিন্নপত্রাবলী'রই ভাষায়—'অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার ··· একটা সংগীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে' থাকে। রবীন্দ্রনাথের গানে, এই বাজনারই নাম বীণা।

২

অন্য একটি চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'এক একটা গান যেমন আছে যার আস্থায়ীটা বেশ, কিন্তু অন্তরটা ফাঁকি—আস্থায়ীতেই সুরের সমস্ত বক্তব্যটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়াতে কেবল নিয়মের বশ হয়ে একটা অনাবশ্যক অন্তরা জুড়ে দিতে হয়। যেমন আমার সেই "বাজিল কাহার বীণা" গানটা—তাতে সুরের কথাটা শেষ না হওয়াতে গান যেখানে থামতে চাচ্ছে কথাকে তার চেয়ে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া গেছে।'

এই মন্তব্যটি থেকে আমরা গানের এক ভিন্ন সমস্যায় পৌঁছতে

পারি। কথা আর সুরের এই মিলনদ্বন্দ্বের সম্পর্ক যে রবীন্দ্রনাথের অনেকদিনের ভাবনা, তা আমরা জানি। আমরা জানি যে কথার গৌরবেই শেষ পর্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গান, কথারই পক্ষে তিনি যুক্তি সাজাতে চান প্রথম যৌবন থেকে পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত বারবার। কিন্তু সেইসঙ্গে এ-ও ঠিক যে সুরের বিস্তার কখনো কখনো তাঁর গানকে করে দেয় কথাবিরল। ভারতীয় রাগসংগীতের মতো সে-গান অভিভূত করতে পারে আমাদের, ১৮৯৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সমস্ত সকাল জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ভৈরবী রাগিণীতে গেয়েও যেতে পারেন 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'র দুটিমাত্র লাইন (কেননা বাকিটা লেখার দরকার হয়নি আরো বহুদিন পর্যন্ত), তবু, পাঠযোগ্য কবিতা হিসেবে তার কি কোনো আকর্ষণ থাকবে আর?

প্রশ্ন হতে পারে, কেনই-বা সে-আকর্ষণ দাবি করব আমরা। তাঁর গানের বইগুলিতে রবীন্দ্রনাথ কি একাধিকবার আমাদের সতর্ক করেননি যে, সুরহীন কথার শ্রীহীন বৈধব্য কিংবা বাক্য আর ছন্দের পঙ্গুতা পাঠকের পক্ষে পীড়াজনক হতে পারে? ঠিক। তবে এর উলটোটাও যে তাঁর মনে ছিল, সে-কথা বুঝতে পারি যখন জীবনের অন্তিমে পৌঁছে 'গীতবিতানে'র নূতন বিন্যাসের জন্য ব্যস্ত হন তিনি, 'গীতবিতান'কে যখন তিনি করে তুলতে চান নূতন ধারার এক কাব্য-গ্রন্থেরই মতো। সুরের সাহায্য ছাড়াও যে এর একটা মূল্য হতে পারে, সে-কথা নিশ্চয় মনে হয়েছিল তাঁর।

এই দ্বিধার ফলে রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা দুই পদ্ধতিরই ব্যবহার দেখতে পাব। কখনো সুরের প্রাধান্যে কথার বিরলতা, আর কখনো কথার প্রবলতায় কবিতার আস্বাদন। কোন্‌টা কখন?

খুব অল্প বয়সের প্রবন্ধে গান আর কবিতার সম্পর্কের বিষয় বলতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন যে, গানে আছে একটিমাত্র ভাবের উপর অবস্থান, আর কবিতায় আছে গতিশীল ভাব। কেবল 'হায়' শব্দটির বেদনা নিয়েই কত-না-দূর তান বিস্তার করতে পারে গান, ভেবেছিলেন তিনি। হৃদয়ের মধ্যে যে 'আশার জলাঞ্জলি প্রচ্ছন্ন আছে' তাকে বার করে আনতে পারে সেই তান। কিন্তু কবিতা যে এই শব্দটিকে আরো বাড়িয়ে নিতে চায় অনেক রূপেরও মধ্যে, অনেকভাবে, সেখানেও কি পৌঁছতে চাইবে না গান? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ওই প্রবন্ধে, 'এখনো সংগীতের সে বয়স হয় নাই।' রবীন্দ্রনাথের গান সংগীতের এই অল্প বয়স থেকে পরিণত বয়সে পৌঁছবার গান, তাঁর জীবনের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখব যে গানকে তিনি কবিতারই মতো গড়ে তুলতে চেয়েছেন অল্পে-অল্পে।

'বাজিল কাহার বীণা'র আস্থায়ীতেই সুরের বক্তব্য সম্পূর্ণ হলো বলে মনে হয়েছিল তাঁর, 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'র দু-লাইন গেয়েই তৃপ্ত ছিলেন তিনি গোটা-একটা সকাল, যদিও শেষ পর্যন্ত এসব গানের কথা বেড়েও যায় একটা প্রত্যাশিত সীমা পর্যন্ত, পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট এক গড়নে। কিন্তু এমন অনেক গান আছে তাঁর, যা তিন বা চার বা পাঁচ লাইনেই শেষ হয়ে যায়, কথা যেখানে প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে না একেবারেই, 'এ পরবাসে রবে কে হায়' 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে' 'স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে' 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল' 'কার মিলন চাও বিরহী' 'নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও' অথবা এরই মতো আরো শ-খানেক ছোটো ছোটো লেখা। উদাহরণগুলি শুনবার সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য প্রবল এক প্রতিবাদ জেগে উঠতে পারে কারো মনে।

কথার আকর্ষণ নেই এখানে? এর মধ্যে বেশ কয়েকটি লাইনকে কি বলা যায় না রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কয়েকটি স্মরণীয় উচ্চারণ? সত্যিই তাই। কিন্তু এ-ও যেন ওই 'হায়' শব্দটির মতোই শেষ হয়ে গেল প্রায়, ওই একটি লাইনেই, পরে আর বাড়বার তেমন জায়গা পেল না কোনো। অর্থাৎ, এ-গানগুলির তীব্র স্মরণযোগ্যতা তার সুরের অলংকারে আর তার প্রথম বাণী-বিন্যাসটুকুতে মাত্র, প্রথম লাইনটি ছেড়ে এলেই নিষ্প্রভ হয়ে আসে কথা, মনে পড়ে যায় আমাদের: 'গান যেখানে থামছে চাচ্ছে কথাকে তার চেয়ে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া গেছে।' এটা ভাবা শক্ত হয় যে 'নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে / নিত্য তোমারে হেরিব'-এর মতো সাধু সংকল্পে পৌঁছবে 'নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও', অথবা 'কার মিলন চাও বিরহী'র পরের লাইন হবে 'তাঁহারে কোথা খুঁজিছ ভব-অরণ্যে', কিংবা 'পিপাসা হায় নাহি মিটিল' শেষ হবে এইভাবে:

> গরলরসপানে জরজর পরানে
> মিনতি করি হে করজোড়ে
> জুড়াও সংসারদাহ তব প্রেমের অমৃতে।

এইরকমই অন্যগুলি।

এটা যে হতে পেরেছিল তার একটা বড়ো কারণ নিশ্চয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটো গানগুলির প্রায় সবই তৈরি হয়েছিল অন্য-কোনো হিন্দুস্থানী গানের সুরে বসিয়ে। কারো মুখে কোনো দক্ষিণী বা হিন্দি বা পাঞ্জাবি গান শুনে, তার মুগ্ধতায় যে সেই সুরেই কবি গান বানাতেন অনেক সময়ে, এ আমরা সবাই জানি। সাহানা দেবী বলেছিলেন: 'একদিন তাঁকে "মহারাজা কেওয়াড়িয়া খোলো"

আর "প্রেম ডগরিয়া মোচন করো" গানদুটি শুনিয়েছিলাম। শুনে খুব খুশি হয়ে কবি তখনই ঐ দুটি হিন্দি গানের সুরে দুটি বাংলা গান লিখে ফেললেন। "মহারাজা কেওয়াড়িয়া"র সুরে লিখলেন "খেলার সাথি" গানটি; আর "প্রেম ডগরিয়া" রূপান্তরিত হলো "যাওয়া আসারই এ কী খেলা"য়।' এ-অভিজ্ঞতা কেবল সাহানা দেবীরই নয়, এইভাবে সুরে কথা বসানোর আরো অনেক সাক্ষ্য মেলে সহজেই, আর সেইসব ক্ষেত্রে, ব্যতিক্রমহীনভাবে তাঁর কথা হয় সামান্য, পরিসর হয় ছোটো, সাবিত্রী দেবীর দক্ষিণী সুরের একটি গান শুনে যেমন লিখেছিলেন :

নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্লকদম্ববন
জম্বুপুঞ্জে শ্যামবনান্ত, বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।
মন্থর নবনীলনীরদ-পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহকান্তারে।

এমন নয় যে, কথা অল্প হলেই কবিতা হিসেবে তার পাঠ-যোগ্যতা কমে যাবে। তিন চার পাঁচ লাইনের স্মরণীয় কবিতা পৃথিবীতে লেখা হয়েছে অনেক, রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা লিখেছেন কিছু। 'নীলাঞ্জনছায়া'র এই শেষ উদাহরণটিতে রচনার অবয়ব ক্ষীণ বটে, কিন্তু এরই মধ্যে যে আছে কবিতারও ঘনতা তাতে সন্দেহ নেই কোনো। তবে কি এ-কথা বলা ভুল হলো যে ছোটো এই গানগুলি কবিতা থেকে দূরে সরে আছে?

এ-প্রশ্নের উত্তর ভাবতে গেলে একটি তথ্যের দিকে আমাদের মন দেওয়া চাই। যে শ-খানেক গানের কথা এখানে বলছি, তার দশ-বারোটি মাত্র রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশোত্তীর্ণ জীবনের রচনা, বাকি সবই তাঁর প্রথম যৌবনের, আর এরও একটা বড়ো অংশ নির্ধারিত

কেবল ব্রহ্মসংগীত হিসেবে। এ-গানগুলিরই কথার সঙ্গে সুর যেন অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, এ-গানগুলিরই সুর যেন কেবলই ভুলিয়ে রাখে কথাগুলিকে। কিন্তু পঞ্চাশোত্তীর্ণ রচনায় গান-কবিতার মিলনের দিকে তাঁর ঝোঁক এতটাই বড়ো, কথার গরিমায় এতটাই সতর্ক আর সচেতন তিনি যে এ-সময়ে লেখা অল্প কয়েকটি ছোটো গানেও তাঁর কথার গরজ কম নয়, কম নয় শব্দ আর ছবির কবিতাময় আবেষ্টন।

৩

গানের মধ্যে কবিতার দিকে কীভাবে এগোচ্ছিলেন কবি, তার একটা ছোটো ইঙ্গিত আমরা পেতে পারি, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে। 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্য কয়েকটি রচনা পাঠিয়ে সেই সঙ্গে লিখছেন: 'কিন্তু এগুলো গান সে কথা মনে রেখো—সুর না থাকলে এ যেন নেবানো প্রদীপের মতো—এ তো ছাপতে দিতে ইচ্ছা করে না।...[বসন্তে আজ ধরার চিত্ত] এর মধ্যে তো কোনো আইডিয়া নেই এর যে বাসন্তী চঞ্চলতা আছে সেটি গানের সুরেই ব্যক্ত হচ্চে—শাদা কথায় এর কোনো নেশা নেই—এই জন্যে কাগজে ছাপবার যোগ্য বলে একে মনে করি নে। বরঞ্চ আর একটা দিচ্চি সেটা যদিচ গান তবু চলতেও পারে।'

যে-গানটি দিলেন তিনি পরিবর্তে, সে হলো 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি।' প্রায় পাশাপাশি লেখা এ-দুটি রচনায় একটিকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন কবিতা হিসেবেও পাঠ্য, অন্যটিকে নয়। কী অভাব ছিল সেই অন্যটিতে? 'বুকের পরে দোলে দোলে দোলে দোলে রে তার পরাণপুতলা', এই দোলাকে সুর দিয়েই যে তিনি

ধরতে চেয়েছেন বেশি, দোলা শব্দের এই আবর্তনের মধ্যেও তা বোঝা যায়। কেবল এই লাইনটিতেই নয়। এরও পরে কয়েক লাইনে আটবার ফিরে আসে ওই শব্দ, ফলে শব্দ দিয়ে অন্য কোনো গহন ছবি তৈরি করবার আয়োজন এখানে নেই আর। তুলনায় 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি' গানটির মধ্যে আমরা পাব প্রায় একটা ঘটনার আদল, আলতো এক নাটকীয়তা, রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই যা হয়ে ওঠে এক সাধারণ ধর্ম। ভাব থেকে ভাবান্তরে যাবার এই কাহিনী, এই নাটকীয়তা, শব্দ প্রতিমা অথবা এমন-কী ছন্দেরও কোনো চমৎকৃতি সৃষ্টি, এরই মধ্যে কবি ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর 'আইডিয়া'র বিস্তার, গীতাঞ্জলি-পর্ব থেকে যেটা স্পষ্ট হয়ে এল তাঁর গানে। ঠিক সেইজন্যেই, কেবল এই চিঠিতেই নয়, কেবল এই গানটির বিষয়ে নয়, এ-সময় জুড়ে প্রায়ই তাঁকে বলতে হবে এমন সব আশ্চর্য স্বীকারোক্তি : 'অনেকদিন পরে গান লিখতে গিয়ে সামলাতে না পেরে কবিতা লিখে ফেলেছি সে জন্যে সকল পাঠকের ক্ষমা প্রার্থনা করি—এ রকম অপরাধ এখন আর বেশি হবে না।' কী-সব গান বিষয়ে তাঁর এই কুণ্ঠা ? 'পাখি আমার নীড়ের পাখি' 'এই বুঝি মোর ভোরের তারা' 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে' 'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়' বা 'আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে'র মতো রচনাগুলি ছিল সেই গান, যা তখন ছাপা হচ্ছিল নানা সাময়িকীতে, বইতে ছাপতে গিয়ে বলতেও হলো যাদের 'কাব্যগীতি'। কিন্তু এই 'কাব্যগীতি' বইটির বাইরে অন্য গানগুলিতেও এখন কেবলই ঘটবে তাঁর এই 'অপরাধ', গানকে কবিতা করে তুলবার 'অপরাধ'।

উত্তরজীবনের এই 'অপরাধ'টিকেই হয়তো ইন্দিরা দেবী নাম

দিয়েছিলেন 'ইসথেটিক'। তাঁর প্রথম যুগের গানগুলি ইমোশনাল আর পরের গানগুলি 'ইসথেটিক', ইন্দিরা দেবীর এই শ্রেণীভাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের নিজেরই তুলনীয় এক মন্তব্য : 'পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য।' এখানে 'পরিণত' শব্দে কবি কোন্ সময়টিকে বোঝাতে চান তা অবশ্য একটু অস্পষ্ট হয়ে আসে 'কেন বাজাও কাঁকন' গানটির উল্লেখে। হতে পারে যে 'এ গানটিতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা', কিন্তু বলা চলে না যে পদ্মাতীরবর্তী গানগুলির এইটেই ছিল সাধারণ ধর্ম। ১৯৩৫ সালে যখন ধূর্জটিপ্রসাদকে ও-কথা জানাচ্ছিলেন কবি, হয়তো তখন তাঁর খেয়াল হয়নি যে 'কেন বাজাও' তাঁর চৌত্রিশ বছর বয়সের লেখা, রূপ দেবার এই পরিণত বয়স বলতে হয়তো তিনি 'গীতাঞ্জলি'-উত্তর জগৎকেই ভাবছিলেন। অন্তত পাঠক বা শ্রোতা হিসেবে আমাদের এ-বিশ্বাস বেড়ে ওঠে যে তাঁর ষাট-সত্তর বছর বয়সের গান প্রধানত রূপোল্লাসের গান, কথার দিক থেকে তা অনেক বেশি শিল্পময় আর আত্মসচেতন।

সাতাশ বছর বয়সে 'মায়ার খেলা'য় লিখেছিলেন সখীদের গান 'এসো এসো বসন্ত ধরাতলে'। শিথিলবিস্তার সেই গানে দূরে-দূরে ছড়িয়ে ছিল এইসব লাইন : 'আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণে / আনো নবযৌবন হিল্লোল' 'সুখসুপ্ত সরসীনীরে এসো এসো' 'এসো যৌবনকাতর হৃদয়ে / এসো মিলনসুখালস নয়নে / এসো মধুর শরম মাঝারে।' মনে কি হয় না যে চৌষট্টি বছর বয়সের 'গৃহ-প্রবেশে'র মধ্যে একেই আমরা পাব সংবৃত সংহত 'যৌবনসরসীনীরে' গানটির মধ্যে ? সেখানেও আসে সমীরণ, সেখানেও আসে মিলন-শতদলের শরমরক্তরাগ, কিন্তু তা আসে প্রায় কবিতারই এক আত্ম-

নির্ভরতা নিয়ে, পরিণত ঘন প্রতিমায়। এইভাবেই তাঁর উত্তরপর্বের প্রেমের গানগুলিতে প্রেম তার দিব্যতার সঙ্গে নিয়ে আসে এক দীপ্তিকেও। তখন আমরা পাই, 'দুয়ারে এঁকেছি রক্তলেখায় পদ্ম আসন / সে তোমারে কিছু বলে' 'ঘনযামিনীর আঁধারে যেমন জ্বলিছে তারা / দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক তেমনি বাজে' 'কাননপর ছায়া বুলায় ঘনায় ঘনঘটা / গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা' 'রজনীগন্ধা অগোচরে যেমন রজনী স্বপনে ভরে' 'সুদূর বনগন্ধ আসি করিল কোলাকুলি' 'ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে / অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে' 'দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে / গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে' বা 'তব চরণতল-চুম্বিত পন্থবীণা'র মতো জটিল প্রতিমাবলীর অভিভব। অথবা কখনো আসে, 'তোমার চক্ষু দিয়ে আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি' 'আপনারে দেয় ঝরনা আপন ত্যাগরসে উচ্ছলি' 'নির্মল দুঃখ যে সেই তো মুক্তি / নির্মল শূন্যের প্রেমে' 'এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গে' বা 'দুখের ফলের ভার অশ্রুর রসে ভরা'র মতো তত্ত্বগাঢ় উচ্চারণ। অথবা আসে 'চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া তরঙ্গ সিন্ধুর' 'মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ' 'বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছন্দে' বা 'চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে'র মতো ধ্বনির নানা উল্লাস। দু-একটি নাট্য-মুহূর্তের প্রয়োজনের কথা ছেড়ে দিলে, অনেক দূরে সরে গেছে এখন কুঞ্জবন, যমুনা বা বাঁশির মতো বৈষ্ণব পট, অথবা 'হৃদয়ের একূল ওকূলে'র পরিচিত সেই সরল আবেগগুলি।

'ছিন্নপত্রাবলী'র দিনগুলিতে একবার দুঃখ করেছিলেন কবি, 'আমার কবিতায় আমি কিছুই লিখতে পারি নি। যা অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে পারি নে।' কেননা তাঁর মনে হয়েছিল ভাষা তো

তাঁর একলার নয়, সাধারণের ব্যবহারের প্রতিদিনের ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না সেই ভাবলোক যা তিনি অনুভব করেন তাঁর সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে। অনেকদিন পর (১৯৩০), সাবিত্রী দেবীর গলায় গান শুনে কি সে-কথাই আবার মনে হলো তাঁর, যখন তিনি লিখলেন 'বেদনা কী ভাষায় রে মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে' ? কিন্তু বাতাসে-বাতাসে সঞ্চারের সেই চঞ্চল বেগকে তবু তিনি বেঁধে নিতে পারলেন তাঁর নিজেরই গড়ে তোলা এক নতুন ভাষায়, তাঁর প্রকৃতি দিয়ে যা অনুভব করেছেন তাকে তিনি করে তুলতে পারলেন আমাদের সকলের অভিজ্ঞতার ভাষা। প্রত্যেক গীতিকবির রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হতে থাকবে বলে আশা করেছিলেন কবি তাঁর কুড়ি বছর বয়সে, আশা করেছিলেন যে তাহলে আমরা পাব একদিন 'গানের বাল্মীকি গানের কালিদাস।' আজ যখন আমাদের সমস্ত বেদনাকেই সহজে ভাষা পেতে দেখি তাঁর গানে, তখন আমরা বলতেও পারি যে তাঁর সে-আশা মিথ্যে থাকেনি আর, 'ভাবের গঙ্গোত্রী' থেকে 'ভাবের সাগরসংগম' পর্যন্ত অনুসরণ করে তাঁর গান আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় সম্পূর্ণ এক কবিকে, আমাদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম আমরা পাই এক 'গানের বাল্মীকি' বা 'গানের কালিদাস'কে, গানের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়ে যাই কবিমনের বিকাশের এক ইতিহাস, যেখানে 'দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধারা।'

ধরেছি ছন্দোবন্ধনে

কথা আর সুর, এই দুয়ের মধ্যে কার প্রতিপত্তি বড়ো হবে গানে, এ নিয়ে অনেকদিনের তর্ক আছে তা আমরা জানি। এ-ও আমাদের অজানা নয় যে গান রচনার প্রথম যুগেই এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে একটা মীমাংসা করে নিতে হয়েছিল, বলতে হয়েছিল, 'আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই' অথবা 'আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।' কবিতা আর গানে যে বড়ো একটা প্রভেদ নেই, এ হলো ভাবপ্রকাশের দুটি ভিন্ন পদ্ধতি মাত্র, আর এ-পদ্ধতিদুটোর মধ্যে আজও জিতে আছে কবিতা, কেননা বাতাসের মতো সূক্ষ্ম আর পাথরের মতো স্থূল সমস্ত ভাবকেই প্রকাশ করা যায় কবিতায়, এই ছিল একদিন রবীন্দ্রনাথের মত। অর্থাৎ, গানের কথার প্রতিই তাঁর পক্ষপাত ছিল তখন।

কিন্তু দীর্ঘ ষাট বছর জুড়ে শিল্পচর্চা করেছেন যিনি, শিল্পের বিভিন্ন রূপ বিষয়ে তাঁর ধারণা যে এই দীর্ঘকাল ঠিক একইরকম থাকবে, এটা আশা করা যায় না। পরীক্ষা আর অভিজ্ঞতার বিস্তার যত বাড়ে, ততই স্পষ্ট আর পরিণত হয়ে ওঠে কোনো ধারণা, কখনো এমন-কী পালটেও যায় কোনো-কোনো বোধ। অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে, 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় ঘোষণা করলেন যে প্রথম যৌবনের ওই স্পর্ধিত মতটি ছিল ভুল। কথা যেখানে পৌঁছতে পারে না নিজের জোরে, সেখানেই উড়ে যায় সুর, কথার চেয়ে তাই সুরের মূল্য তখন বেশি মনে হলো তাঁর।

আবার, জীবনের প্রান্তে পৌঁছে, মৃত্যুর তিন বছর আগে, অনায়াসে কবি বলতে পারলেন এই কথা: 'মত বদলিয়েছি; জীবনস্মৃতি অনেককাল পূর্বের লেখা।' দিলীপকুমার রায় বা ধূর্জটিপ্রসাদকে চিঠিপত্রে আবার জানাচ্ছেন তিনি, বাংলা গানে কথার ভূমিকা কত বড়ো হতে পারে, সুরের দাসত্ব করা তার কাজ না একেবারেই।

এ-সব তর্ক কখনো-কখনো হয়তো একটু নিষ্ফল বাগ্‌বিস্তারের দিকে এগিয়ে গেছে, কখনো-কখনো যে-বিরোধ কল্পনা করা হয়েছে তা হয়তো আপাতবিরোধ, দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়তো সম্ভব ছিল। কিন্তু কথা আর সুরের মধ্যে রচয়িতার এই চেতনাগত দ্বিধা তাঁর রচনার ইতিহাসেও একটা পরিবর্তনধারা তৈরি করছে, এটা লক্ষ করবার বিষয়। বিচার করবার বিষয় এইটে যে গানের কথাগুলিকে যখন তিনি লেখেন, তখন কতটা তাঁর দৃষ্টি থাকে সুরের দিকে, আর কতটাই-বা কথায়। তথ্য থেকে আমরা জানি বটে যে অনেক সময়ে জ্যোতিদাদা পিয়ানোতে সুর তুলতেন আর সেই সঙ্গে কথা বসিয়ে যেতেন রবীন্দ্রনাথ, সুর আগে, কথা পরে। আবার কোনো-কোনো পূর্বরচিত কবিতাকে সুরে ভরে দিয়েছেন তিনি, কথা আগে, সুর পরে। কিন্তু এ থেকেও পুরো ধরতে পারি না তাঁর লক্ষ্যের কেন্দ্র। ধরতে পারি না, আমরা কি রচনাগুলিকে কেবল গান হিসেবেই শুনব, না কবিতা হিসেবেও পড়ব।

এ-প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গেই সবার মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের নিজের পরামর্শ। অল্প বয়সে সেই বেথুন সোসাইটির বক্তৃতা থেকে শুরু করে পরম্পরায় অনেক গানের বইতেই তিনি সাবধান করেছেন আমাদের যে, এ-রচনা পড়বার নয়, কেবল শুনবারই যোগ্য।

কিন্তু সত্যি-সত্যি কি তাঁর এই সতর্কবাণীর উপর বেশি নির্ভর করব আমরা? কেবল প্রথম যুগে নয়, 'প্রবাহিণী'রও ভূমিকায় সবিনয়ে লিখলেন তিনি : 'যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার সবগুলিই গান, সুরে বসানো। এই কারণে কোনো-কোনো পদে ছন্দের বাঁধন নাই।' শান্তিদেব ঘোষের মতো অনেকেই একে ধরে নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের একটি স্বীকৃতি, কিন্তু 'প্রবাহিণী'তে সংকলিত অজস্র রচনার মধ্যে দু-চারটি মাত্র মিলবে যেখানে পাঠ্যছন্দ বাধা পায় কিছু : 'জ্বলে নি আলো অন্ধকারে', 'ও আমার ধ্যানেরই ধন' অথবা 'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে'র মতো কয়েকটি মাত্র গান। বিস্মিত হই আমরা দিলীপকুমারের কাছে রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়ৎ দেবার ধরন দেখে। কেননা 'গীতাঞ্জলি' থেকে যে চার-পাঁচটি গানের কোনো-কোনো লাইনে ছন্দ-শিথিলতা দেখিয়ে চিঠি লিখেছিলেন দিলীপকুমার, তার কয়েকটি তো স্পষ্টতই বাঁধা মাপের ছন্দ, আর যে-দুয়েকটিতে ব্যতিক্রমের ঈষৎ আভাস আছে তা কবিতার মধ্যেও অনেক সময়ে দেখতে পাব আমরা। 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া—এ-গানে গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ। অতএব তালকে সেলাম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে থাকতে হলো' বলছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আমরা, যারা কবিতা হিসেবেও পড়তে চাই এই রচনা, আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে 'গীতাঞ্জলি'তে গানের ও-লাইনটি ও-রকমভাবে সাজানোই নয়, সেখানে আছে

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া

দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।

আর এভাবে সাজানোর সঙ্গে-সঙ্গে বোঝা যায় যে পাঠ্যছন্দ হিসেবে 'ধবল পালে' পর্বটিতে পুরো ছ-মাত্রা না-থাকলেও ক্ষতি নেই কোনো, পড়ার কোনো বাধা হয় না ওতে, যেমন 'দেখি নাই কভু দেখি নাই'-এর অন্তিম পর্বেও পাচ্ছি কেবল চারমাত্রা।

তাহলে কেন তিনি লিখছেন এই কৈফিয়ৎ, এই ধরনের, বারে-বারে ? এর একটা গৌণ কারণ হতে পারে এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এসব রচনাকে পড়ছেন তাঁর অতি পরিচিত সুরের ভঙ্গি থেকে, সুরের ছন্দে, আর সেদিক থেকে দেখলে কবিতার ছন্দ আলগা বলে মনে হতেই পারে অনেক সময়ে। এ নয় যে রবীন্দ্রনাথের গানে সুরের ছন্দ আর কথার ছন্দ কখনোই মেলেনি। কখনো-কখনো দুটি তো এক মাপেই বসানো। কিন্তু এ-ও ঠিক যে অনেক সময়ে এরা চলেছে ভিন্ন পথে। 'মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি' লাইনটিকে সুরের স্মৃতিতে কেউ পড়তে পারেন, 'মোর বী/ণা-ওঠে / কোন সুরে / বা-জি-'। 'সুন্দর বটে / তব অঙ্গদ / খানি' একে হয়তো কারো পড়তে ইচ্ছে হবে :

সুন্দর / বটে তব / অঙ্গদ / খা-নি-
তারায় তা / রায় খচি / ত।

ক্ষতি কি যদি এইভাবেই পড়ি ? ক্ষতি এই যে এর পরের লাইনেই বাধা পাবে এর স্বাভাবিক পাঠ, কথার ছন্দে এলে চার মাত্রায় ধরা যাবে না :

স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি, –
বর্ণে বর্ণে রচিত।

এই সংকটের খুব এক পরিচিত উদাহরণ আছে 'ঐ আসে ঐ / অতি ভৈরব / হরষে' লাইনটিকে 'ঐ আসে / ঐ অতি / ভৈরব / হরষে' ধরনে পড়ার মধ্যে।

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের ধারণার পিছনে এই অভ্যাসটাই যে মূল কারণ, তা নিশ্চয় নয়। এর চেয়ে বড়ো কথা হলো তাঁর এই স্মৃতি যে, একদিন তিনি ভাঙা ছন্দে গান লিখেছেন অনেক। বাংলা গানে ছন্দের একটা গড়ন আছে, ছন্দেই লিখেছেন একদিন রামপ্রসাদ বা নিধুবাবু, কিন্তু বস্তুত সেখানে আছে ছন্দের একটা আলতো ভঙ্গি মাত্র, অনেক সময়েই তা নিয়মিতভাবে পড়বার যোগ্য নয়।

বিরহ অনল শীতল হলো এতদিনে
অনেক দিবসের পরে, হেরিয়ে মুখ তোমার, বয়েছে আনন্দনীর,
আমার নয়নে।
বিনে অনুকূল বিধি কোথায় মিলয়ে নিধি
সুদীনের সুদিন, হইবে কে জানে।

নিধুবাবুর এই গানে বুঝে নেওয়া যায় অক্ষরবৃত্তের চালটি, কিন্তু তাহলেও এর প্রথম লাইনদুটি যে সুগম নয়, তা-ও মানতে হবে। আর এটি তাঁর রচনায় কোনো ব্যতিক্রমের উদাহরণ নয়, এটিকেই বলা যায় সাধারণ রীতি।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনের প্রথমার্ধে এ-রকম অব্যবস্থ দ্বিধান্বিত ভাঙা লাইন লিখেছেন বেশ-কিছু, সে-স্মৃতি তিনি ভোলেননি সহজে। তাই সব সময়ে তাঁর মনে থেকে গেছে একটা কৈফিয়তের গরজ। তবু, এই তথ্য মনে রেখেও বলা সংগত যে, গানের সূচনা করেছিলেন কবি কবিতারই জগৎ থেকে, পদ্যবন্ধনে নিপুণভাবে বাঁধতেই চাইছিলেন তিনি বাংলা গানকে, সতেরো বছর বয়সে লেখা তাঁর

প্রথম কয়েকটি গানের কথা 'জীবনস্মৃতি'তে বেশ আবেগভরেই বলছেন তিনি, বলছেন কীভাবে লেখা হলো 'বলি ও আমার গোলাপবালা' বা 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়'। কিন্তু এর সবই তো ছন্দে বাঁধা? 'গীতবিতানে'র সম্পাদক আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন অবশ্য যে 'গানের বহি'তে যেভাবে ছাপা আছে 'নীরব রজনী' তা এর আদিরূপ নয়; কিন্তু প্রথম চার লাইনের নজিরে বোঝা যায় যে পরিবর্তনের মাত্রা খুব বেশিও নয়। সমকালীন গীতিনাট্যগুলোর আদর্শ ছিল ভিন্ন, চলতি জীবনের কথাবার্তায় কেমন করে সহজেই এসে যায় সুর, হার্বার্ট স্পেন্সরের সাহায্য নিয়ে সেইটে তখন বোঝাচ্ছেন তিনি, এবং নাট্যসংলাপের ভাঙা চেহারায় প্রয়োগ করেছেন সেই সুর। এই ব্যতিক্রম ছেড়ে দিলে দেখব, যুবক রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঝোঁক কথার ছন্দের দিকে, আর আমাদের মনে পড়ে যাবে বেথুন সোসাইটিতে তাঁর সেই বক্তৃতার প্রসঙ্গ, যেখানে গানের কথার উপর তাঁর পক্ষপাতের নজির ছিল স্পষ্ট।

এটা অবশ্য ঠিক যে কথার ছন্দও তাঁর হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়নি তখনো। কেবল গানের ইতিহাসে নয়, কবিতার ইতিহাসেও এ হলো তাঁর গড়ে উঠবার সময়, অনেক স্খলনপতনের মধ্যে দিয়ে শিল্পপ্রকরণকে বুঝে নেবার চেষ্টা। তাই ছন্দ কখনো শিথিল হয়ে পড়ে, মিশ্র হয়ে যায় হঠাৎ। সে যে কোনো সচেতন পরিকল্পনায়, তা মনে করবার কারণ নেই। যেন খানিকটা অসতর্কভাবেই মিলে যায় অক্ষরবৃত্তে-মাত্রাবৃত্তে বা মাত্রাবৃত্তে-স্বরবৃত্তে, পাঁচ মাত্রা ছ-মাত্রা জায়গা বদল করে নেয় কখনো।

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা সাধের কানন মোর

আমার সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া, মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—

এইভাবে যার শুরু, তার হঠাৎ পরিণতি হয়

হেথায় জোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে, প্রমোদে কানন ভোর।

এ-রকম অতর্কিত বদল তাঁর পরিণত বয়সের গানেও যে একেবারে দুর্লভ তা নয়। 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে' শুনে যদি মনে হয় যে এ-গান শুরু হলো স্বরবৃত্তে, অল্প পরেই ভেঙে যাবে সে-ধারণা, দেখব এটি চলছে আসলে পাঁচ মাত্রার চালে।

বাতাস জল আকাশ আলো   সবারে কবে বাসিব ভালো

হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে।

অথবা, এর উলটো যেমন, ছ-মাত্রায় শুরু করে ঘুরে যাওয়া স্বরবৃত্তে: 'গানে গানে তব / বন্ধন যাক / টুটে'। এর পরেই এর চলন হবে আলাদা: 'রুদ্ধবাণীর / অন্ধকারে / কাঁদন জেগে / উঠে'। গানে এমন ঘটেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিণত কবিতায় এ-রকম আমরা পাব না কখনই, স্বরবৃত্তে সেখানে আসতে পারে না এমন সম্পূর্ণ ছ-মাত্রার পর্ব।

২

তাহলে ছন্দেই তিনি ধরতে চাইছেন তাঁর প্রথম কয়েকটি গান। কিন্তু প্রধানত কোন্ ছন্দে? বাংলা গানের সবচেয়ে আপন ছন্দ স্বরবৃত্ত, যাকে কখনো বলা হয়েছে লৌকিক ছন্দ, কখনো-বা ছড়ার। রামপ্রসাদে, বাউলে, গ্রাম্য লোকগানে ঘুরে-ফিরে এই ছন্দেরই প্রয়োগ শুনতে পাব আমরা। আর, এ-ছন্দকে যে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেননি, এমনও নয়। কুড়ি বছর বয়সেই একটি বইয়ের

সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন তিনি, যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে এগোতে চায় বাংলা কবিতা, তবে তার ছন্দ তখন হবে রামপ্রসাদের ছন্দ। একেই তবে একদিন তরুণ কবি মনে ভেবেছিলেন বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক পরিণতি, ছন্দের ভবিষ্যৎ? কিন্তু তাই যদি ভেবেছিলেন, তবে কেন সে-ছন্দ তাঁর কাব্যরচনায় তেমন ব্যবহারে এল না আরো প্রায় কুড়ি বছর? কেন তিনি অপেক্ষা করছেন 'ক্ষণিকা' বা 'শিশু'র কবিতাবলী পর্যন্ত? এর একটা কারণ হতে পারে এই যে ওই ছন্দকে তখনো তিনি ভাবছেন প্রধানত গানের ছন্দ, সুরের। আবৃত্তির যোগ্য কবিতায় তখনো এর প্রয়োগ বিষয়ে মন ঠিক করতে পারেননি তেমন।

তাঁর নিজের গানে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতারই দিক থেকে এগোতে চাইছিলেন, এগোতে চাইছিলেন কথার দিক থেকে, তার আরো একটা ইঙ্গিত আছে বোধহয় এইখানে। তাঁর প্রথম যুগের গানেও তিনি প্রত্যয় নিয়ে ধরতে পারলেন না স্বরবৃত্ত, গানের সেই স্বাভাবিক ছন্দ। পরিবর্তে তাঁকে নিতে হলো অক্ষরবৃত্তই, যে-অক্ষর-বৃত্ত রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রায় দু-হাজার গানে অল্পই দেখতে পাই। 'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি—' গানে:

> দেখো ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
> জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া নূতন জীবন লভি।
> তবে তুমি কি সজনী জাগিবে নাকো,
> আমি যে তোমারি কবি।

অথবা 'বলি ও আমার গোলাপবালা'য় 'সখী, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি কিসের শরম এত' পড়তে গেলে স্পষ্টই ত্রিপদীর চালটি ধরা যায়। এইসব গানে, কিংবা 'অয়ি বিষাদিনী বীণা'য়

'আমি আর্যলক্ষ্মী এই হিমালয়ে এই বিনোদিনী বীণা করে লয়ে' কিংবা

ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যতদিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি ততদিন তুই কাঁদ্ রে।

এইসব উচ্চারণের বলয়ে আমরা রামপ্রসাদ বা বাউলের পটভূমি পাই না একেবারেই, পাই বরং হেমচন্দ্রীয় কবিতাচর্চার পিছুটান।

অবশ্য অক্ষরবৃত্ত তাঁর হাতে অল্পে-অল্পে পরিণত হয়েছে। যেমন কবিতার, তেমনি গানের অল্পস্বল্প উদাহরণক'টিতেও কিছুদিনের মধ্যে দেখা দেবে অক্ষরবৃত্তের যোগ্য প্রসারণ, তার স্থিতিস্থাপকতার পূর্ণ ব্যবহার। 'এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের খেলা'র মতো ষোলো মাত্রার লাইনেও এখন সুর দেবেন তিনি, অথবা তৈরি করবেন এই-সব-গান: 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি' 'দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে' অথবা একেবারে আঠারো মাত্রার এইসব লাইন:

রজনীর শেষ তারা, গোপনে আঁধারে আধো-ঘুমে
বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম কুসুমে।

পর্বভাগের চটুলতা সরে যাবে অনেকটা, কথার টানে আসবে একটা গম্ভীরতা বা বিষাদের বিস্তার, সুরে-ছন্দে-কথায় একটা সামঞ্জস্য তৈরি করে জেগে উঠবে একদিন: 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক / তবে তাই হোক।'

৩

'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রেই মনে করতে পারবেন এর "মৃত্যুশোক" অধ্যায়টি। যে-শোক হয়তো তাঁকে ভরে দিতে পারত নৈরাশ্যের

অতলতায়, সীমাহীন গ্লানিতে, আশ্চর্য যে সেই শোক থেকে তিনি পেয়ে গেলেন যেন জীবনের এক মস্ত মুক্তি। মনে হলো তাঁর : 'আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম।' জগৎকে সম্পূর্ণ করে দেখবার যোগ্য একটা দূরত্ব যেন পেলেন তিনি, আচার ও আচরণে সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে উঠলেন সৃষ্টিছাড়া। এই অভিজ্ঞতারই অল্পদিন পর তাঁর বাইরের জীবনেও এল মুক্তির বোধ। জোড়াসাঁকোর গণ্ডির মধ্যে নয় আর, এবার তিনি বেরিয়ে পড়ছেন পশ্চিমভারতে অথবা উড়িষ্যায় কিংবা পদ্মাতীরের দিনগুলিতে। ভিতরে-বাহিরে এই মুক্তির স্বাদ কবিতার ছন্দেও নিয়ে আসবে এক নবীন উল্লাস, হঠাৎ তাঁর কাছে খুলে যাবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মৌলিক রহস্য, যুক্তব্যঞ্জনের সংঘাতকে তার পূর্ণ মূল্য দিয়ে এবার তিনি লিখতে পারবেন : 'বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ বাহুতে মোর।' ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, ওই 'বন্ধন' শব্দটির সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের শেষ বন্ধন গেল খুলে, তাঁর প্রবাহ হলো স্বচ্ছন্দ, ধ্বনিহিল্লোলে ভরপুর। আর কবিতায় যদি তা এল, তবে গানেই বা নয় কেন। গানেও এবার অনায়াসে গড়ে উঠছে চার মাত্রার, পাঁচ মাত্রার, ছ-মাত্রার, সাত মাত্রার ছন্দ। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র ঝংকার এতদিনে তাঁর কাজে লাগল পুরোপুরি।

পুরোপুরি বলছি এইজন্যে যে, এর আগে যখন তিনি ধরতে চেয়েছেন সেই ঝংকার, অন্তত একবার ভানুসিংহ ঠাকুরের পদগুলিতে যেমন, সেখানে সব সময়ে ছিল না কোনো সুনির্দিষ্ট সংগতি। কেননা, যদিও সেখানে পাব 'মন্দ-মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে',

কিন্তু ওরই সঙ্গে এখানে আছে : 'ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে বকুল যূথি জাতি রে'। এই দ্বিতীয় লাইনটিতে আমাদের স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ থেকে সরে আসছি দূরে, সেই স্বাভাবিকতার মধ্য থেকেই কবি তৈরি করতে পারছেন না তরঙ্গ, পরে যেমন করবেন এইখানে : 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল'। এ হলো চার মাত্রার মাত্রাবৃত্ত, অল্পই আছে রবীন্দ্রনাথের গানে, আরো একটি স্মরণীয় উদাহরণ এর : 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায় / মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা'। এই যে দুটি গান, এরও আবার ছন্দস্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়ে যায় যেন পর্বসাজানোর ভঙ্গিতেই। 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' রচনাটিতে কেবল পর্বই যে দ্রুত শেষ হচ্ছে তা নয়, লাইনটিও শেষ হচ্ছে অল্প সময়ে। আর পর্বসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে ওরই মধ্যে ধরা যায় খানিকটা মন্থরতার তান : 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল'।

চার মাত্রার ভিতরে জায়গা কম। পর্বসংখ্যা বাড়িয়ে-কমিয়ে তার কিছু বৈচিত্র্য তৈরি করা যায়, এই মাত্র। এই মাত্রা যত বাড়বে, ভিতর দিকে বৈচিত্র্যের অবসরও বাড়বে তত। এল পাঁচ মাত্রার ছন্দ। 'অহহকলয়ামিবলয়াদিমণিভূষণম্' : এ-লাইন যেদিন ঠিকমতো পড়তে পেরেছিলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ, সে-আনন্দ তিনি ভোলেননি কখনো। সেই আনন্দেরই চকিত টানে সূচনাপর্বে তিনি লিখেছেন বটে :

> আঁধার শাখা উজল করি হরিত-পাতা-ঘোমটা পরি
> বিজন বনে, মালতীবালা, আছিস কেন ফুটিয়া।

কিন্তু এর দুর্বলতাটা রয়ে গেল যুক্তব্যঞ্জন এড়িয়ে চলবার ধরনে। 'মানসী'র কবিতাবলী থেকে সেই দুর্বলতা জয় করছেন কবি, কিন্তু

গানের জগতে তার যে খুব ব্যবহার হলো তা নয়। 'বিরস দিন বিরল কাজ' 'নিবিড় ঘন আঁধারে' 'ঘুমের ঘন গহন হতে'র মতো কিছু-কিছু গান আমাদের মনে পড়ে বটে। কিন্তু সেখানে কোথায় যুক্তব্যঞ্জনের প্রার্থনীয় সেই আঘাত-পরম্পরা? বলবার মতো ব্যতিক্রম নিশ্চয় 'একদা প্রাতে কুঞ্জতলে অন্ধবালিকা / পত্রপুটে আনিয়া দিল পুষ্পমালিকা' — একটা সামর্থ্য বেজে উঠছে এর মধ্যে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ভাবতে হবে যে এটি মূলত গান নয়, কবিতা হিসেবেই লেখা হয়েছিল এটি, এর সুরসংযোগ অনেক পরের ঘটনা। তা নইলে পাঁচ মাত্রার গান তাঁর চলছে এইরকমই, যুক্তব্যঞ্জনকে অনেকটা এড়িয়ে গিয়ে :

বিরস দিন, বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে
এসেছ প্রেম, এসেছ আজ কী মহা সমারোহে।

কবির একেবারে প্রথম যে-গানগুলির উল্লেখ করেছি আমরা, যার ছিল একটা অক্ষরবৃত্ত ত্রিপদীর গড়ন, সেখানেই গোপনে-গোপনে তৈরি হচ্ছিল ছ-মাত্রার বৃত্তের প্রতিও তাঁর উন্মুখতা। কিন্তু এক্ষেত্রেও, সেটা ঘটে উঠতে পারেনি কেবল যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার বিষয়ে অনিশ্চয়তায়। সে-অনিশ্চয় যখন মুছে গেল, তখন ছ-মাত্রার কবিতা এল বন্যাধারার মতো, মাত্রাবৃত্ত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ছ-মাত্রাকেই ব্যবহার করেন সবচেয়ে বেশি। আর তাই, এটা হয়তো আশ্চর্যের নয় যে তাঁর গানেও এ-রকমই পর্ব আমরা দেখতে পাব বারবার। পরিসংখ্যানে দেখা যাবে স্বরবৃত্তের কথা ছেড়ে দিলে, এই ছন্দই তাঁর গানে আসতে পায় সবচেয়ে বেশি। 'ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে'র মতো প্রেমের গানও যেমন তৈরি হতে পারে এই ছন্দে, তেমনি দিনের পর দিন এই ছন্দ ধরে থাকে তাঁর আত্ম-

নিবেদনগুলি : 'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো' 'নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে, ওগো অন্তরযামী' 'যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু' অথবা 'সকল গর্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব ছাড়িব না'র মতো অসংখ্য গান। এরই মধ্যে অল্প একটু বৈচিত্র্য তৈরি করেন তিনি পর্বসংখ্যার পরিবর্তনে, অথবা হঠাৎ, খুব পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় একটি মাত্রা সরিয়ে নিয়ে হয়তো-বা : 'ভালবেসে সখী / নিভৃতে যতনে / আমার নামটি / লিখো —তোমার / মনের মন্ / দিরে / আমার পরাণে / যে গান বাজিছে / তাহারি তালটি / শিখো — তোমার / চরণ মন্ / জীরে'। প্রতিটি চতুর্থ পর্বে এইভাবে কবি ছেড়ে দিচ্ছেন একটি মাত্রা। লিখো বা শিখো-র পর আমাদের আশা থাকে আরেকটু, পূর্ণ হয় না সে-আশা, আর তৈরি হয় ঈষৎ একটা চমক।

বৈষ্ণব কবিতায় দু-একবার উঁকি দিয়ে গেছে ছ-মাত্রার চেয়েও আরেকটু বেশি, দেখা দিয়েছে সাতের তাল। অসম্ভব নয় যে গোবিন্দদাসের এসব ধ্বনিমাধুর্য কানে ছিল রবীন্দ্রনাথের : নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ / জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ। চার মাত্রায় আছে দুই-দুইয়ের সমান পরিমাপ, ছ-মাত্রায় ইচ্ছে করলে পাওয়া যায় তিন-তিন, রবীন্দ্রনাথ বলতেনও একে তিন মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই সমতার বোধ যে ভেঙে যায় পাঁচ মাত্রায় এসে অথবা সাত মাত্রায়, সেইটেকে তাঁর মনে হয়েছিল কানের পক্ষে ভালো, প্রত্যাশাকে আঘাত করতে পারে বলেই ভালো। এর নাম দিয়েছিলেন তিনি বিষম ছন্দ, আর কবিতায় এর দেখাও মিলবে অনেক।

কবিতায় দেখা মিলবে, কিন্তু যখন সে-প্রয়োগকে তিনি

থরতে চাইছেন গানের সীমায়, তখন তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে আরেকটু বেশি। 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর, / চোখের জলে আঁখি ভরভর' যদি পাঠ্যছন্দ হিসেবে বাধাজনক না হয়, তবে সুরের ছন্দেই-বা এ পতিত হবে কেন? ১৯১৭ সালে একে যখন রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করছেন এগারো মাত্রার ছন্দ হিসেবে, তখন স্পষ্টতই সুরের কথা মনে হচ্ছে তাঁর, মনে হচ্ছে সুরের ছন্দে এ হবে এক উৎপাতের মতো। একে বলাও হয়েছে রবীন্দ্র-সৃষ্ট তাল আর এই তালের রকমফেরে তিনি লিখলেনও অনেক। কথার ছন্দের পরিভাষায় আমরা একে এগারো মাত্রার তাল বলব না, বলব সাত মাত্রার। পরে একটি অপূর্ণ পর্ব পাচ্ছি চার মাত্রার, এই মাত্র। অপূর্ণ এই অংশটি হতে পারে নানা রকমের। যদি দুই করি, তাহলে পাব 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে / ভ্রমর মরে পথ ভুলে'। যদি করি তিন, তাহলে পাব: 'বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে / হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে'; পাঁচ? তা-ও মিলবে: 'ছিল যে পরানের / অন্ধকারে / এল সে ভুবনের / আলোক-পারে / স্বপনবাঁধা টুটি / বাহিরে এল ছুটি / অবাক আঁখি দুটি / হেরিল তারে'। পাব এমন-কী ছয়ের অপূর্ণ পর্বও: 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' অথবা 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে, / বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।' 'এমন-কী ছয়' বলছি এই জন্যে যে 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি লিখবার সময়ে, ওই ১৯১৭ সালে, রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন যে এটা করা যায় না। 'ইহার মধ্যে ছয়মাত্রা কিছুতেই সহিবে না—' এই ঘোষণা করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে 'তোমারি নীলবাসে নিল কায়া' লেখা সম্ভব, কিন্তু লেখা যায় না 'তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর'। অথচ সেই 'নীল'ই ফিরে এল সফলতার নজির হিসেবে, তেরো

বছর পরে যখন লিখলেন 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে / দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

সাত মাত্রার বৈচিত্র্য যে কেবল অন্ত্যপর্বের ভিন্ন-ভিন্ন মাপ নিয়েই তৈরি হলো, তাই শুধু নয়। কবিতায় দেখি, এই ছন্দে হাত দেবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি পর্বমধ্যের চাল। পাঠকদের সুবিধের জন্য কবিতার সঙ্গে লিখে দিচ্ছিলেন এই মন্তব্য : 'এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক'; আর লিখেছিলেন, 'ছিলাম নিশিদিন / আশাহীন / প্রবাসী / বিরহ তপোবনে / আনমনে / উদাসী' অথবা 'শব্দ নাহি আর / চারিধার / প্রাণহীন / কেবলি ধুকধুক / করে বুক / নিশিদিন'। এই শেষ উদাহরণটিতে, সকলেই লক্ষ করবেন, চার আর তিন নয়, দুটি চারের পর্ব আসছে পর-পর, আর অমনি আমাদের কানে পৌঁছে যায় গানেরও এক পরিচিত উদাহরণ : 'একদা তুমি প্রিয়ে / আমারি এ / তরুমূলে / বসেছ ফুলসাজে / সে কথা যে / গেছ ভুলে।'

মাত্রাবৃত্তের এইসব ধ্বনিতরঙ্গ তৈরি করবার আরো একটি পদ্ধতি ছিল রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তে। বৈষ্ণব ব্রজবুলি অথবা তার প্রতিধ্বনিত ভানুসিংহের গানগুলি পড়বার সময়ে, আমরা টের পাই একটি কৃত্রিম উচ্চারণ পদ্ধতির টান, সংস্কৃত ধরনে দীর্ঘ হ্রস্ব মেনে চলবার প্রবণতা। ঠিক মেনে চলাও অবশ্য বলা যায় না একে, এর মধ্যে সব সময়ে নেই কোনো অতিনির্দিষ্ট নিয়ম। 'নীরদ-নয়নে'র 'নী'-কে যদি দীর্ঘ করতে হয় তবে তার মানে এ নয় যে 'নীর-ঘন-সিঞ্চনে'র 'নী'-কেও পড়তে হবে টেনে। দীর্ঘ মাত্রাকে কখনো-কখনো দীর্ঘের মূল্য দিয়ে পুরোনো উচ্চারণের এই ধরনটি রবীন্দ্রনাথ

তাঁর গানে আনেন অনেক সময়েই। তখন আমরা কবিতা হিসেবে একে পড়তে সামান্য বাধা পাই হয়তো। পড়তে হয় 'দে-শ দে-শ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভে-রি' অথবা 'মা-তৃ-মন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আ-জ হে', কিংবা 'জা-গ জা-গ রে জা-গ সংগীত'। এর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে দীর্ঘ ওই টানের সঙ্গেই আমরা যেন গান-গুলির সুরের আদলটাও পেয়ে যাই।

কবিতা হিসেবে কি একেবারেই পড়া যায় না একে? আমার তা মনে হয় না। আধুনিক কালে সুধীন্দ্রনাথও যখন হঠাৎ লেখেন তাঁর 'অর্কেস্ট্রা'র ধ্বনিপুঞ্জ: 'আগত আগত উদার সবিতা প্রাচী রঞ্জিত রাগে'—তখন তার দীর্ঘ ধ্বনির টানেই যেন সূর্যোদয়ের আভাসটি ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে আকাশে। আর দেখব, রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই প্রত্নপঙ্ক্তিটি রেখে দেন কোনো উদাত্ত আহ্বানের জন্য, দেশ বা চিত্তের উদ্‌বোধন, অথবা অল্প কয়েক সময়ে নিছক কৌতুক সৃষ্টির জন্য, 'চা-স্পৃহ-চঞ্চল-চাতকদল চলো' যেমন।

অবশ্য এসব ক্ষেত্রেও, অনেক সময়ে কবি স্বাধীনতা নেন একটু, হঠাৎ দু-একবার মাপের হয়তো ইতরবিশেষ ঘটে কিছু: 'তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ নন্দন হার' এর 'নে' উচ্চারণ যে সব সময়ে সমান ওজন পাচ্ছে তা নয়। এমন-কী এ-লাইনেও আছে অল্প স্বাধীনতা: 'জাগ জাগ রে জাগ সংগীত—চিত্ত অম্বর কর তরঙ্গিত': রে বা গী এখানে দু-মাত্রার জায়গা পাবে না।

৪

কথার ছন্দ মনে রেখে গান শুরু করেছিলেন একদিন, বলে-ছিলেন তখন 'কথাই বড়ো'। কিন্তু তারপর, যদিও একদিকে

চলছিল ছন্দের নানা বৈচিত্র্যতৃষ্ণা, তারই পাশাপাশি ছিল ভাঙা ছন্দেরও চর্চা, সুরের কথাই শুধু মনে রেখেছেন যখন, লিখছেন

এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়,
জগৎপুরবাসী সবে কোথায় ধায়॥
কোন্ অমৃতধনের পেয়েছে সন্ধান,
কোন্ সুধা করে পান!
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায়।

তাই একদিন 'জীবনস্মৃতি'তে পাল্‌টে নিলেন মন, ঘোষণা করলেন সুরই বড়ো। সুরই বড়ো, কিন্তু কোন্ সুর? সে কি কথারই অন্তঃস্থ এক সুর নয়? সে কি কথার ছন্দের নির্যাস থেকে পৌঁছতে পারে না মনে? অন্তত, 'নৈবেদ্যে'র অল্প পর থেকে, 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র রচনাবলীতে, কবিকে দেখছি ভাঙা ছন্দের ব্যবহার থেকে একেবারে সরে এসেছেন দূরে, কথার ছন্দকে নিখুঁত করবার সব আয়োজন এখানে তৈরি, আর সে-ছন্দ হলো এবার মূলত স্বরবৃত্ত। প্রথম সংস্করণের 'গীতবিতান' ছিল কালানুক্রমে সাজানো; এর প্রথম আর দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে মস্ত প্রভেদ, দ্বিতীয় খণ্ডের পাতায়-পাতায় জুড়ে আছে বাংলা গানের স্বাভাবিক রীতি, স্বরবৃত্ত। এই এতদিনে রামপ্রসাদের ছন্দকে অনায়াসে কবি বাহন করলেন তাঁর গানের, স্বভাবতই রামপ্রসাদের চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন শিল্পিত ভঙ্গিতে। আগে যে কবি একেবারে লেখেননি এটা এমন নয়। শান্তিদেব ঘোষ যে বলেছেন ১৮৯২ সাল পর্যন্ত এমন গান সতেরোটির বেশি নয়—সে-ও হয়তো সম্পূর্ণ ঠিক তথ্য নয়, তার চেয়ে একটু বেশিই মিলবে। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'র মতো গানও এ-সময়ে লিখতে পেরেছেন তিনি।

তবু এ-কথা সত্যি যে এই শতাব্দীতে পৌঁছবার আগে, বাউলবৈরাগীর নিবিড় সাহচর্যের আগে, এ-ছন্দ তাঁর হাতে পরিণত আনন্দে আসে-নি। আর, একবার যখন এল, তখন, এইটেই হলো তাঁর গানের প্রধান ছন্দ।

কিন্তু এর মধ্যে যে বিচিত্রতার সম্ভাবনা নেই, তা কি রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির পক্ষে বাধা হলো না কোনো? প্রতি পর্বে চারটি স্বর, এই নীতি মেনে সবই কি তিনি লিখতে প্রস্তুত হবেন? তখন দেখি, এখানেও, পূর্ণ অপূর্ণ পর্বে মিলিয়ে নানা রকমের ছন্দতাল তৈরি করে নেন তিনি, ধরেন বাউলের এই ঝোঁক, প্রথম পর্বে একমাত্রা কমিয়ে দিয়ে: 'আলো যে / যায় রে দেখা' 'ঘরেতে / ভ্রমর এল / গুনগুনিয়ে / আমারে / কার কথা সে / যায় শুনিয়ে' 'তুমি যে / চেয়ে আছ / আকাশ ভরে', 'তোমারি / ঝরনাতলার / নির্জনে' অথবা 'না বলে / যায় পাছে সে'র মতো অনেক গান। আসে নানা রকম ভঙ্গে: ৩।৪, ৩।৪।৪, ৩।৪, ৩।৪, ৩।৪।৪

ওই আলো যে / যায় রে দেখা—
হৃদয়ের / পুব-গগনে / সোনার রেখা।
এবারে / ঘুচল কি ভয় / এবারে / হবে কি জয়? /
আকাশে / হল কি ক্ষয় / কালীর লেখা?

স্বরবৃত্তেও এমনিভাবে এক পর্ববৈচিত্র্য গড়ে তোলেন তিনি, আবার এরই সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম ঝংকার তৈরি করে নেন পর্বে-পর্বে ভিতরে-বাইরে কিছু মিল দিয়ে।

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।

যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনিধারা।

প্রথম ছ-মাত্রার পর, এই রচনা চলছে চারটি পূর্ণ পর্বে, আবার শেষটি অপূর্ণ। কিন্তু এই সহজ হিসেবের চেয়েও স্বতন্ত্র একটি আওয়াজ পাচ্ছি এখানে, কেননা, মধ্যমিলের সঙ্গে-সঙ্গে যেন থমকে যাচ্ছে চলন, পা তোলা পা ফেলার মধ্যবর্তী সময় পাচ্ছি যেন একটু।

আবার এর মধ্যে দেখা দিচ্ছে তবে প্রসাধনেরই ইচ্ছে। স্বর-বৃত্তে এই ইচ্ছে চলে পর্বভাঙার মধ্য দিয়ে, অথবা এই মধ্যমিলের কৌশলে। অন্যান্য ছন্দেও এ-রকমই নানা পদ্ধতি নেন রবীন্দ্রনাথ, তার একটি বড়ো সূত্র হলো যুক্তব্যঞ্জনের অকৃপণ বিতরণ, স্বরবৃত্তে যার সুযোগ ছিল কম। অল্প বয়সে একদিন যে তাঁকে এড়িয়ে চলতে হচ্ছিল এই যুক্তব্যঞ্জনের জটিলতা, তার হিসেব যেন শোধ করে দিচ্ছেন এখন, এখন লিখতে চাইছেন বারবার 'মনোমন্দির-সুন্দরী / মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি / স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা / অয়ি মঞ্জুলা মুঞ্জরী!' অথবা 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে', কিংবা

তিমির-অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
আজি সঘন শর্বরী, মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ ঝ'রি ঝরিছে জলধারা,
তমালবন মর্মরি পবন চলে হাঁকি।

সকলেই লক্ষ করবেন, পুরো এই গানটি জুড়ে কবির শিল্পী-কলম কত সচেতন সন্তর্পণে চলছে, নিয়মিতভাবে প্রতি লাইনের দ্বিতীয়

পর্বে আসছে একটি যুগ্মবর্ণের আঘাত, আর তারপরই সব তরল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রায় সংস্কৃত ছন্দের অতিনিয়মিত ধ্বনিসম্পদের কথা মনে পড়ে যায় আমাদের, আর সেই স্পন্দ তিনি টেনে নিয়ে আসেন এমন-কী ছন্দোহীন কোনো টুকরোর মধ্যেও কখনো এই যুগ্মবর্ণেরই সাহায্য নিয়ে :

> নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,
> জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ ॥
> মন্থর নব নীলনীরদ-পরিকীর্ণ দিগন্ত।
> চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহকান্তারে।

ছন্দ নেই, কিন্তু এর স্পন্দ যেন ধরিয়ে দেয় কোনো অগোচর ছন্দ, যেন নানা ছন্দের একতাল মিশ্রণ, এই হলো এক মুক্তরীতি।

৫

একদিন ছন্দের আলোচনায় বসে কবির মনে হয়েছিল, কবিতায় একেবারে গদ্যের ব্যবহার সম্ভব। নিজের পক্ষে তিনি টেনে এনেছিলেন কিছু প্রাকৃত কবিতার মধ্যবর্তী ইতিহাস, উল্লেখ করেছিলেন :

> বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে
> শীতল পবন বহে সঘনে
> কনক বিজুরি নাচে রে অশনি গর্জন করে।

ছন্দ নেই এখানে, কিন্তু একেবারেই কি নেই? এই প্রশ্ন করেছিলেন তখন। একেও তিনি খুলে দিতে চেয়েছিলেন আরো একটু, পৌঁছতে চেয়েছিলেন একেবারে ছন্দোহীন গদ্যের সমতলে। কিন্তু মধ্যবর্তী এই উদাহরণটির মতোই কিছু গান লিখেছেন তিনি অনেক দিন।

এমন-কী একেবারে এই উদাহরণটির শব্দধ্বনেই পাব আমরা মুক্ত ছন্দের এই গানটি, সেই অশনিতর্জন :

প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কি দুর্দিন—
দারুণ ঘনঘটা অবিরল অশনিতর্জন্।

এই গানটির অন্তর্গত যুক্তব্যঞ্জনগুলি, বিশেষত পরপর এই রেফ্-এর সমাহার 'গর্জন, দুর্দিন, তর্জন'-এর মধ্যে একটা পৌরুষ এনে দিচ্ছে। অথচ গানটি লেখা হয়েছিল সম্ভবত শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখের উত্তরণের জন্য। কিন্তু এ কি সে-রকম উত্তরণ যেমন হতে পারত 'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়' অথবা 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু'তে যেমন পাই ? 'গীতাঞ্জলি'র আগে লেখা হলেও এই গানটির মধ্য দিয়ে বস্তুত ধরা পড়েছে 'গীতাঞ্জলি'র পরবর্তী এক মনোভঙ্গি, ইমোশনকে এখানে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা আছে, আছে নিজেকে নিজের বাইরে থেকে দেখা। যে-অর্থে ইন্দিরাদেবীকে বলেছিলেন তিনি যে তাঁর প্রথম বয়সের গান ইমোশনের, আর পরবর্তী গান ইস্থেটিক ; অথবা যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ বলেন, একসময়ে তিনি গানে ধরতে চেয়েছেন রসলোক, আর পরে রূপলোক—এই গানের মধ্যে আছে তার সূচনা-ইঙ্গিত। এ হলো রূপের বা ইস্থেটিক জগতের উল্লাস।

ছন্দ যদি মুক্তই হলো এতটা, যদি গদ্যের এত কাছেই এল, তাহলে সম্পূর্ণ গদ্যেই বা কেন দেওয়া যাবে না সুর। জীবনের শেষ কয়েক বছরে রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা এরই সাহসিক চেষ্টা দেখব। এটা সুরের ছাঁচে কথা বসিয়ে দেবার মতো ব্যাপার নয়, ছন্দোহীনতার উৎস এখানে সুর নয়, কথাতেই এবার সুর বসানোর পালা, সুরেরই উৎস এখানে কথা। অনেকদিন আগে হার্বার্ট স্পেন্সারের

যে-মন্তব্য নিয়ে খুশি ছিলেন তিনি, এবার এল তার যোগ্য উৎসার। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় এর অল্পস্বল্প ব্যবহার ছিল বটে, কিন্তু সুরবিহীন ভাবে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কথা তেমন জোরালো হয়ে আসে না পাঠকের কাছে। অথচ এইবার 'চিত্রাঙ্গদা-চণ্ডালিকা-শ্যামা'য় অনায়াসে এল সেই শক্তি। এ-সব নাট্যরচনার ভূমিকায়, আরো একবার, কবি সতর্ক করেছেন আমাদের। বলেছেন, পড়বার যোগ্য নয় এ-রচনা, এ কেবল শুনবার। কিন্তু তিনি জানেননি যে, পড়েও এর এক অসম তাল পাই আমরা, আর তা যে কেবল সুরের সংযোগেই মহিমময় তা নয়, তার আছে কথার ছন্দেরও আকর্ষণ, মিশ্র আর গদ্যছন্দে। 'চিত্রাঙ্গদা'য় মদন যখন বলে 'মণিপুরনৃপদুহিতা / তোমারে চিনি তাপসিনী / মোর পূজায় তব ছিল না মন / তবে কেন অকারণ / তুমি মোর দ্বারে এলে তরুণী / কহো কহো তাপসিনী' — তখন একটু-একটু দুলতে-দুলতে 'তবে কেন অকারণ' অংশে এসে যায় চার মাত্রার মাত্রাবৃত্তের ভঙ্গি — আর সেইটিকেই তুলে নিয়ে আসে চিত্রাঙ্গদার স্বর : পুরুষের বিদ্যা / করেছিনু শিক্ষা / লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা। আর হঠাৎ, অপূর্ণ পর্বকে ছোট্ট করে দিয়ে জাগিয়ে তোলা তনু হিল্লোল : কুসুমধনু / অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু।

'চিত্রাঙ্গদা'র চেয়েও সমতলের গদ্য আমরা পেয়েছি 'চণ্ডালিকা'য়। মুখের কথাই সেখানে সুর পেয়ে যায়। গানেই বলা যায় সেখানে : 'সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর। স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায় মা মরা বাছুরটিকে। সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধভিক্ষু আমায়, বললেন জল দাও জল দাও।' কিন্তু এই রচনাংশটির এপাশে-ওপাশে আছে এমন দুটি

লাইন, যার ছন্দোরূপ খুব প্রত্যক্ষ, আর তা একেবারে নিষ্কারণও নয়। মা যখন জিজ্ঞেস করছেন তাঁকে, কী তোর দুঃখ, কী ভাবা বলিস তুই—তখন প্রকৃতির শরীর ভরে উঠছে বিস্তারে, আনন্দে—ছ-মাত্রার তালে তার স্বর জেগে ওঠে: এ নতুন জন্ম নতুন জন্ম নতুন জন্ম আমার। তারপর এল বিবরণ, সেই দুপুরের আশ্চর্য স্মৃতির সন্তর্পণ বর্ণনা, কিন্তু সেই বর্ণনার শেষে, জল দাও আহ্বানটি আবার মনে পড়ছে যখন, চমকে উঠছে সমস্ত শরীর, তার বর্ণনার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ছন্দও যেন শিউরে ওঠে একবার, স্বরবৃত্তের তীব্র ঝনৎকারে শুনি আমরা 'শিউরে উঠল দেহ আমার চমকে উঠল প্রাণ।'

ছন্দে একদিন শুরু করেছিলেন যিনি, তিনি এইভাবে এসে পৌঁছলেন সচেতন ছন্দ ভাঙার কাজে। কথারই মূল্য পুরো পেতে চান বলে ছন্দ ধরেছিলেন একদিন, আবার কথারই ভিতরকার পুরো সুরটিকে খুলে নেবেন বলে আজ ছেড়ে দিচ্ছেন ছন্দকে। বেথুন সোসাইটিতে তাঁর যে-ধারণার প্রকাশ হয়েছিল একদিন, সেইখানেই আবার এসে পৌঁছলেন এক মস্ত বৃত্ত সম্পূর্ণ করে—কিন্তু তার বাইরের অবয়ব হলো ভিন্ন।

কিন্তু এই পৌঁছনো, ছন্দকে এই মুক্তির দিকে নিয়ে আসা অথবা তাকে পৌঁছে দেওয়া গদ্যে—এ কি কবির ইচ্ছাকৃত নয়? পরিকল্পিত নয়? এ কি কয়েকটি আকস্মিক মুহূর্তের স্ফুরণ মাত্র? আশৈশব রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে যুক্ত আছেন যিনি, গীতিশিল্পে যাঁর অখণ্ড অধিকার, সেই শান্তিদেব ঘোষ বলছেন: এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোনো সচেতন অভিপ্রায় দেখলে ভুল করা হবে। কিন্তু কেমন করে তা ভাবব আমরা? যখন দেখছি যে কবিতা-রচনার জগতেও ঠিক এ-রকমই সমান্তরাল মুক্তি সন্ধান চলছে তাঁর

দীর্ঘদিন জুড়ে, যখন দেখছি তিনি গদ্যছন্দের পক্ষে কথা বলছেন বারবার তাঁর জীবনের শেষ পনেরো বছর, যখন দেখছি "সংগীতের মুক্তি" আলোচনাতেও তিনি নিয়ে আসেন ছন্দেরই সমস্যা, আর যখন শুনছি নির্মলকুমারী মহলানবীশের মতো কাউকে তিনি লিখছেন 'ইচ্ছে করলে গদ্যেও সুর দেওয়া যায় না ভাবছ? লিপিকাতেও সুর দেবার ইচ্ছে আছে আমার', তখন কি একটা অভিপ্রায় লক্ষ করাই সংগত নয়? শান্তিদেব বলছেন, কেবল সেই গানগুলিতে দেখা যাবে ছন্দের অভাব, যেখানে হিন্দী ভাঙা সুর এসেছে আগে, আর তার আয়তনের মধ্যে তিনি প্রয়োগ করেছেন কথা। কবিতায় যখন সুর দেওয়া হয়, কেবল তখনই পাই ছন্দ। কিন্তু এই সামান্যী-করণ তথ্যের সমর্থন পাচ্ছে না। আমরা দেখি, জীবনের একেবারে শেষ কয়েকটি গানের মধ্যে, নৃত্যনাট্যের বাইরেও, তাঁর ছন্দভাঙারই ঝোঁক।

ভালোবাসা এসেছিল
 এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে
 দিইনি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
 শব্দ তার পেয়ে
ফিরায়ে ডাকিতে
 গেনু ধেয়ে।

এই কবিতা, বা এই সময়ের আরো কয়েকটি অনুরূপ রচনা, বিধিমতো ছন্দেই সাজানো। এর সঙ্গে যদি তুলনা করে দেখি এর পূর্বতন গীতিরূপ, তবে ধরা পড়ে সেই ছন্দোহীনতার ধরন :

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে।
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে —
দিই নি তাহারে আসন।
বিদায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে।
সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন
নিশীথ তিমিরে বিলীন —
দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা।

মৃত্যুর প্রায় এক বছর আগে যিনি লিখতে চেয়েছিলেন এ-রকম, অথবা 'নির্জন রাতে নিঃশব্দচরণপাতে কেন এলে' বা 'এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন'-এর মতো গান, তাঁর মুক্তির ইচ্ছাকে নিতান্ত অচেতন বলা সম্ভব বলে মনে হয় না।

গীতশিল্পী বলেন, গান শুনবার, পড়বার নয়। স্রষ্টা নিজেও আমাদের সতর্ক করে দেন বারেবারে, তাঁর এ-রচনা শুনবার জন্য, পড়বার জন্য নয়। গীতসুধার জন্য পিপাসিত চিত্ত সে-কথা মেনেও নেয় ভিতরে-ভিতরে। কিন্তু তবু আমরা, যারা সবসময়েই গান শুনবার সুযোগ পাব না হয়তো, অন্তত মনের মতো গান, আমাদের মনে পড়বে যে দ্বিতীয় সংস্করণ 'গীতবিতান'কে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর নতুন একটি কাব্যগ্রন্থ হিসেবেই, 'গীতবিতান' পড়তেও চাইব আমরা, সমান উৎসাহে। আর যদি তা পড়ি, তাহলে, যেমন আমরা সুরবিহীনভাবেও মুগ্ধ হব এর শব্দের বা ছবির নিরর্গল ধারায়, তেমনি এর ছন্দও আমাদের আকর্ষণ করবে তার সামর্থ্যে, তার বৈচিত্র্যে, কথার ভিতর থেকে আপনিই তার সুর বার করে আনবার সহজ আনন্দে।

১৯৭৪

একই সঙ্গে নানা শিল্পের চর্চা করেন যাঁরা, তাঁরা কি তাঁদের সেই বিচিত্র শিল্পরূপের মধ্যে একই মনকে প্রকাশ করেন? না কি মনের ভিন্ন-ভিন্ন বিরোধী দিকের প্রকাশ সেটা? মাইকেলেঞ্জেলোর বহুমুখী শিল্পকীর্তির বিষয়ে ভাবতে গিয়ে রোম্যাঁ রলাঁকে বলতে হয়েছিল এর কেন্দ্রীয় ঐক্যের কথা। ন'টি মিউজকে যেমন একসময়ে ভাবা হতো মিউজিকের মতো মহত্তর এক শিল্পের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ মাত্র, তেমনি এক সামগ্রিকতার দিক থেকে দেখা যায় এই শিল্পীর ভিন্ন কাজ, সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় এক 'ডিজাইন', সমস্ত শিল্পের অন্তর্গত মৌলিক যে ডিজাইনটির কথা মাইকেলেঞ্জেলো নিজেই বলতেন তাঁর বন্ধু ভিত্তোরিয়া কলোনাকে। এটা অবশ্য ঠিক যে সেই ডিজাইন সত্ত্বেও কখনো-কখনো একই হাতের দুই স্বতন্ত্র সৃষ্টির মধ্যে আপাতবিরোধের কিছু চিহ্নও ওঠে ফুটে। অন্তত, সিমোন ত্ম বোভোয়া দেখিয়েছেন কীভাবে এই বিরাট মানুষ, তাঁর বার্ধক্যে পৌঁছে, কবিতায় আর চিঠিপত্রে বলছেন নিরাশাময় এক আঁধার জগতের কথা, আর ঠিক সেই একই সময়ে গড়ে তুলছেন রোম শহরে সেন্ট পিটারের মহিমোজ্জ্বল আলোকিত এক চূড়া।

রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কী ভাবব আমরা? বিচিত্র তাঁর শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে মূলগত এক ঐক্যই বড়ো, না কি বিরোধ? একমাত্র ছবির জগতের ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে এতদিন আমরা ধরে নিতে অভ্যস্ত ছিলাম যে নানা রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে সরল একটি

সূত্রে দেখতে পাওয়া যায় স্পষ্টই, একই মনোভাবের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ জেগে ওঠে তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন শিল্পে। কিন্তু এ-অভ্যাসের বিরুদ্ধে আজ প্রশ্ন তোলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, সাহস করে বলেন তিনি: 'সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধলেখক ও ভাষণকার রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-বেদনা ঠিক একই ছাঁচে ঢালাই করা নয়। এইসব ভিন্ন-ভিন্ন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে ন্যূনাধিক ভিন্ন-ভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই; তাদের মধ্যে আত্মীয়তা আছে; কিন্তু তাদাত্ম্য (identity) নেই।'

এই বিশ্বাসের জোরে আইয়ুব বলতে পারেন যে 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ ওই সময়ের গদ্যনাট্যকারের চেয়ে যেন 'একটু কাঁচা বয়সের, একটু নবযুবতী-স্বভাবের মানুষ।' সমস্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো তাদাত্ম্য আছে কি না, সেই ব্যাপক প্রশ্নে আমরা যাব না এখন, আমরা কেবল এখানে বুঝতে চাই গীতিকবি আর নাট্যকারের এই বিরোধের কথাটা। কতটা সত্যি এই বিরোধ? গদ্যনাটক 'রাজা'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কঠিনতম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছেন আমাদের, সকলেই আমরা জানি যে মাধুর্যময় সুন্দরেরই ধ্যান নেই সেখানে। 'সত্য যে কঠিন / কঠিনেরে ভালোবাসিলাম' : জীবনপ্রান্তের এই উচ্চারণের পূর্বচ্ছায়া দেখেছেন কবি 'রাজা'র মধ্য দিয়ে, আইয়ুব তা আমাদের বিশ্লেষণ করে বলেন। কিন্তু তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেন যে সমকালীন 'গীতাঞ্জলি'র কবি কেবল আলোয় বিভোর, রূপসী প্রকৃতিতে মগ্ন, ভ্রান্ত রূপান্ধ সুদর্শনার মতোই তিনি জীবনকে কেবল 'পরম মধুর সুন্দর ও শুভ রূপে' দেখেন। আইয়ুব বলেন: 'গীতাঞ্জলি-পর্বে

"মধুর তোমার শেষ যে না পাই" গোছের কাব্যানুভূতি সম্ভব হয়েছিল, কারণ ঐ কটি বছর কবি রবীন্দ্রনাথ সত্যি সত্যি চোখ মেলে জগতের দিকে তাকান নি।' শুধু 'গীতাঞ্জলি'ই নয়, প্রভেদের এই বর্ণনায় 'গীতাঞ্জলি'-পর্বই তাহলে তাঁর লক্ষ্য এখানে।

দুই শিল্পমানসে এতটাই তবে প্রভেদ যে, একটির বেলায় যদি জগতের দিকে চোখ মেলে তাকানো সম্ভব হয়ে থাকে, অন্যটির বেলায় হয়নি তা? এতটাই সম্ভব যে 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের গানে চলছে কেবল মধুরের খেলা, আর নাটকে তিনি পাচ্ছেন নিষ্ঠুর জীবনের স্বাদ? "মধুর তোমার শেষ যে না পাই" গানটির কথাই যে বিশেষ করে বলতে চান আইয়ুব তা নিশ্চয় নয়, কেননা ও-গান তো লেখা হয়েছিল ১৯২৬ সালে। তিনি নিশ্চয় বোঝাতে চান শুধু এই মানসিকতার ধরনটিকে। কিন্তু এ কি আমরা সহজে স্বীকার করে নিতে পারি যে এতটাই দুস্তর প্রভেদ ছিল একই সময়ের গানে আর নাটকে? নিজের মনকে গড়ে তুলবার সেই সময়টিতে? ঈশ্বরকে যারা 'বড়োই সকরুণ বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে', তাদের যিনি ধিক্কার দিচ্ছেন ১৯০৭ সালের "দুঃখ" প্রবন্ধে, যিনি বলছেন, 'কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে···যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষ-অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায়, যেখানে রক্তসরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে', আর এরই প্রতিচ্ছায়ায় ১৯১০ সালের 'রাজা' নাটকের ধ্বজায় যিনি দেখছেন পদ্মের মাঝখানে এক বজ্র আঁকা, কেবল গানগুলির সময়েই তিনি হয়ে উঠছেন পদ্মাশ্রয়ী শুধু? লুকিয়ে গেল বজ্র? এমন একেবারে হতে পারে না তা নয়, কিন্তু হয়েছে কি তা?

আইয়ুব বলেন, 'গীতাঞ্জলি'র কবি তাঁর প্রেমিক ঈশ্বরকে 'শুধু বাঁশি শুনেই "মন প্রাণ যাহা ছিল" সব দিয়ে ফেলেছেন।' কিন্তু কিসের সে-বাঁশি? সে কি বজ্রেরও নয়? 'গীতাঞ্জলি'তেই তো শুনেছি আমরা 'বজ্রে তোমার বাঁশি বাজে, সে কি সহজ গান?' সহজ শান্তি নয়, সে-গানে তো তিনি খুঁজছেন অশান্তিরই অন্তরে এক শান্তিকে, আরাম থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে সহ্য করতে চাইছেন ঝড়? তাহলে কীভাবে এ-কথা সত্যি হবে যে 'দিনের আলোয় সংসারের মাঝখানে তাঁর হৃদয়ের রাজাকে দেখলে তিনি সহ্য করতে পারবেন না'? এই কথা, অথবা 'আলো কই? এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না—গীতাঞ্জলির কবির মনেও কি এমন কোনো আক্ষেপ তীব্র বেদনার মতো বেজেছিল', আইয়ুবের এ-প্রশ্নের উত্তরে আমাদের কি মনে না প'ড়ে পারে 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো'র মতো গানের কথা? যে-জীবনের কথা 'গীতাঞ্জলি'তে আমরা পাই, তাতেও তো আছে কঠিন সত্যের মুখোমুখি হবার গূঢ় কোনো ভূমিকা, তাই সেখানে কেবলই তো আমরা শুনতে পাব এইসব উচ্চারণ: 'তোমার আগুন উঠুক হে জ্বলে / কৃপা করিয়ো না দুর্বল বলে' 'গরজি গরজি শঙ্খ তোমার / বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার' 'আমার এ প্রেম নয় তো ভীরু / নয় তো হীনবল' 'নাচো যখন ভীষণ সাজে / তীব্র তালের আঘাত বাজে' 'আরো কঠিন সুরে জীবনতারে ঝংকারো' 'বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো' অথবা 'মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো না'। স্পষ্ট এই আকুতির পরেও কি বলা যাবে এ কেবল বাঁশি-শোনা এক নবযুবতীর স্বভাব? আনন্দেরই কথা বলেন তিনি এ গানগুলিতে, কিন্তু কোন্ সে আনন্দ? 'যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে / দুঃখব্যথার

রক্তশতদলে'। "দুঃখ" প্রবন্ধের সেই রক্তসরোবরের কথা আবার আমাদের মনে পড়ে যায়।

বিচ্ছিন্ন কয়েকটি গানেরই কথা নয় শুধু। এ-কথা মনে করবার কারণ আছে যে আত্মিক গড়নের মধ্যেই গীতাখ্য-কাব্য তিনটির সঙ্গে 'রাজা' নাটকের গভীর এক সাধর্ম্য আছে প্রচ্ছন্ন। এই নাটকের, অথবা 'গীতাঞ্জলি'র প্রধান গানগুলির রচনাকালের, ঠিক এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "তিনতলা" নামের এক প্রবন্ধ, যেখানে আমাদের মনের তিন ভিন্ন অবস্থার কথা বলেছিলেন তিনি। এর প্রথম অবস্থা হলো প্রাকৃতিকতার, যখন বাইরের দিকেই আমাদের সমস্ত অভিমুখিতা, যখন আমরা 'সত্য তাকেই বলি যাকে দেখতে ছুঁতে পাওয়া যায়'। কিন্তু জীবনের এই পরিচয় ক্লান্তিতে এসে পৌঁছয় একদিন, অশ্রদ্ধা জন্মায় তার উপর, সংসারকে একেবারে সর্বতোভাবে অস্বীকার করবার এক ঝোঁক দেখা দেয় তখন। যেখানে কেবলই আধিব্যাধিমৃত্যু, যেখানে কেবলই ভয়ংকর, তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম বলে ধিক্কার দিই নিজেকে, সরিয়ে আনি নিজেকে বাইরে থেকে ভিতরে। 'যে-বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম তাকে কঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম।' এইভাবে একদিন এল অন্তরের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে-প্রতিষ্ঠাতেই কি আমাদের অবসান? হতে পারে না তা। পৌঁছতে চাই আমরা সেই আধ্যাত্মিকতায়, তৃতীয় সেই স্তরে, যেখানে 'অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে' ছড়িয়ে পড়তে পারি আমরা, ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্ব যেখানে ঘুচে যায় একেবারে, যখন বলতে পারি 'তখন ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয় তখন সব।'

প্রবন্ধে যাকে তিনি সাজিয়ে ধরেছিলেন এই তিন স্তরে, গীতাঞ্জলি-গীতিমালা-গীতালিতেও সাজানো ছিল প্রায়-অনুরূপ যে তিন স্তর, তারই এক কাহিনীরূপ বা নাট্যরূপ কি পাই না আমরা সুদর্শনার বোধোন্মেষের মধ্য দিয়ে? এ-ও তো সেই প্রাকৃতিকতার উপর নির্ভর, তার ভয়ংকর রূপ দেখে ফিরে আসা, আর পরে এক আত্মবিলীনতার মধ্য দিয়ে জীবনের সর্বোত্তম সত্যে পৌঁছনো। 'রাজা' কথাটিও রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করতে হয়েছিল ওই প্রবন্ধে। সেই রাজার স্বরূপ যখন জানলেন সুদর্শনা, তখন শেষ হলো তাঁর অন্ধকার অন্তঃপুরের কাল, তখন তিনি এসে পৌঁছতে পারেন বাইরে, আলোয়, কেননা এখন আর আলোকে তিনি দেখবেন না ভুল কোনো মায়ায়, এখন তিনি জানবেন 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'র চরিত্র। তখন বলা যায়, 'গীতাঞ্জলি'র যে-গানটি লিখে-ছিলেন তিনি ১৩১৭ সালের ১৪ শ্রাবণ, পৌষ মাসে যেন তারই নাট্য-অবয়ব মুদ্রিত হলো 'রাজা'য় :

যতকাল তুই শিশুর মতো
রইবি বলহীন,
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্ রে ততদিন।
অল্প ঘায়ে পড়বি ঘুরে,
অল্প দাহে মরবি পুড়ে,
অল্প গায়ে লাগলে ধুলা
করবে যে মলিন—
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্ রে ততদিন।

অল্প আঘাতেই মলিন হওয়া এই হলো সুদর্শনার প্রাথমিক পরিচয়। রাজা বলেছিলেন তাকে : 'সহ্য করতে পারবে না, কষ্ট হবে।' যতদিন না সহ্য করতে শিখছেন তিনি, ততদিনই রাজা তাঁকে রাখতে চেয়েছিলেন অন্ধকার তাঁর অন্তঃপুরে, কেননা এখনো তার মন পড়ে আছে শুধু 'ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার'-এর উপর। তিনি জানেন যে ভয়ংকরের কালোতেই একদিন স্নিগ্ধ হয়ে যাবে সুদর্শনার হৃদয়, কিন্তু সেজন্য প্রতীক্ষা চাই, চাই চেষ্টা। এই চেষ্টার কাজ শেষ হবে যখন, তখন, উদ্ধৃত ওই গানের দ্বিতীয় অংশের মতো আমরা দেখতে পাব আরেক ছবি :

যখন তোমার শক্তি হবে
উঠবে ভরে প্রাণ,
আগুনভরা সুধা তাঁহার,
করবি যখন পান—
বাইরে তখন যাস রে ছুটে,
থাকবি শুচি ধুলায় লুটে,
সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
বেড়াবি স্বাধীন—
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্ রে ততদিন।

তখন রাজা বলতে পারেন, 'অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম', যোগ্য জীবনের আলোয় তখন বেরিয়ে আসতে পারেন সুদর্শনা, সহজে বলতে পারেন 'পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব।' তাই, অন্ধকার ঘরের ভয়ংকর নিষ্ঠুর রাজাকে 'গীতাখ্য তিনখানি বইতে' দেখা যায় না বলে মনে হয় না।

ঠিক, বরং সেই নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবার পদ্ধতিতেই ভরে আছে গানের এই পালাটি। তাই 'গীতিমাল্য' বইটিতে একবার অন্তঃপুরকে অর্জন করে নেবার পর 'গীতালি'তে এসে শুনব আমরা : 'সুখে আমায় রাখবে কেন / রাখো তোমার কোলে / যাক না গো সুখ জ্বলে।' কেবল নিজেকে নিয়ে থাকবার কথা নয় আর, পৃথিবীরই সুখদুঃখের কথা এখন শুনতে হয় তাঁকে, চোখ মেলে তাকাতে হয় চারপাশের পৃথিবীরই দিকে, যখন তিনি বলেন 'আমার যদি শক্তি নাহি থাকে / ধরার কান্না আমায় কেন ডাকে?' তাঁর আত্মবোধের গভীরতায় এখন তিনি ধিক্কার দেন তাদের 'আরামে যার আঘাত ঢাকা / কলঙ্ক যার সুগন্ধ / নয়ন মেলে দেখল না সে / রুদ্র মুখের আনন্দ।' এখন আমরা শুধু শুনতে পাই : 'দুঃখ দিয়ে জানাও রুদ্র / ক্ষুদ্র আমি নই তো ক্ষুদ্র' 'কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি' 'বিষম তোমার বহ্নিঘাতে / জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা' 'এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎজ্বালা / এই তো দুখের অগ্নিমালা' 'জীবনকে তোর ভরে নিতে / মরণআঘাত খেতেই হবে' 'জ্বলতে দে তোর আগুনটারে' 'দিয়ে তোমার রুদ্র আলো / বজ্র আগুন যেমন জ্বালো' 'ঐ যে নীরব বজ্রবাণী / আগুন বুকে দিচ্ছে হানি' 'আঘাত হয়ে দেখা দিল / আগুন হয়ে জ্বলবে' 'অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা / চরণ ভরে কাঁপে ধরা' অথবা শেষ পর্যন্ত 'সুখে আমায় রাখবে কেন / যাক না গো সুখ জ্বলে!' এরও পর কি বলা যাবে, গীতাখ্য বইতিনটিতে আছে কেবল মোহন রূপেরই ধ্যান? এ-প্রশ্ন কি সেখানে নিজেই করেননি কবি 'তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে'? এ-ও এক পূজা বটে, কিন্তু এ-পূজা আজ সারা হয় হাহা রবে, এ-পূজায় জানতে হয় যে 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে / আরেক হাতে হার।'

এটা নিশ্চয় ঠিক যে সত্যের এই বোধ রবীন্দ্রনাথকে কোনো হতাশ তমসায় ঠেলে দেয়নি এ-গানগুলির মধ্যে। জীবনের আঘাত আছে, কিন্তু তার ঔদাসীন্য নেই তবু, তার সঙ্গে লিপ্ত হবার এক অস্তিময় তাৎপর্যময় আনন্দ আছে—এ-বোধ নিশ্চয় জেগে ওঠে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানগুলিতে। কিন্তু সে-বোধ তো 'রাজা'রও ? এ-নাটকের রাজা যিনি, তিনি নিষ্ঠুর বটে, তবু উদাসীন তো নন ? যদি উদাসীনই হবেন, তবে সুদর্শনার প্রেম চাইবেন কেন তিনি ? যদি উদাসীনই হবেন, তবে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে, রাজন্যদের লিপ্সাময় আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে, বারেবারেই ফিরে আসতে হবে কেন তাঁকে ? কেন তাঁকে বসে থাকতে হবে সুদর্শনার মনের সেই গড়ে উঠবার প্রতীক্ষায় যেখানে 'মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে' ? কেনই-বা শেষ পর্যন্ত বলতে হবে তাঁকে 'এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো', উদাসীনই যদি হন ? যদি উদাসীনই হন তবে শেষ পর্যন্ত সুদর্শনা কীভাবে বলতে পারেন 'যে নিষ্ঠুর তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে ?' প্রেমের স্বরূপকে জানেনি যে, জীবনকে জানেনি যে, প্রথম যুগের সুদর্শনার মতো সে একে ভাবতে পারে ঔদাসীন্য, 'ঘরেবাইরে'র নিখিলেশকে অনেকসময়ে যা মনে হতে পারত বিমলার, কিন্তু আপাত এই উদাসীনতার মধ্য দিয়ে প্রেমিক কি তাঁর দয়িতাকে গড়ে নিচ্ছেন না তাঁর মর্মমূল পর্যন্ত ? ঈপ্সিত এক বিরহানলে অল্পে-অল্পে জ্বালিয়ে তুলছেন না তার ভিতরকার এক আলো ?

সন্দেহ নেই যে, সমসময়ে রচিত তাঁর গান আর নাটকের গভীরতর নক্‌শায় এই সামঞ্জস্য থাকলেও বাইরের প্রকাশে তার

ভিন্নতাও অনেকটা। শিল্পরূপের নিজস্ব কাঠামোই দাবি করে সেই ভিন্নতা। সেই দাবিতেই তো 'রাজা' আর 'ঘরেবাইরে' এত দুই ভিন্ন রচনা, যদিও তার ভিতরে থেকে গেছে একই ভাবনার আদল। বিমলাও তো সুদর্শনার মতোই তার কৌমার্যের কল্পনায় রেখেছিল এক রূপকথার সৌন্দর্যময় রাজপুত্রকে, কিন্তু বিয়ের পর ভেঙে গেল সেই রূপকল্পনা। নিখিলেশ তাকে বলেছিল বাইরের জগতে এসে মিলতে হবে দু-জনে, আর সেই বাইরে আসবার সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে উঠল আগুন, সন্দীপের বহিরঙ্গ জৌলুশে ভুলল বিমলা, আর নিখিলেশ বলল, রাজার মতোই প্রায় : 'আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব।' কেননা সে জানে, 'ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা।···জবরদস্তি? কিসের জন্যে? সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে?' তাকে পাবার জন্যই আগুন লাগিয়েছিল জেনে পিতৃগৃহে সুদর্শনাকে বলতে শুনি, 'এত বড়ো সাহস। সেই সাহসই আমার সাহস জাগিয়ে দিলে।' আর বিমলাও যেন এর আক্ষরিক পুনরুক্তি করে, 'সাহসের অন্ত নেই, সে সাহসের কোনো আবরণ নেই—একেবারে আগুনের মতো নগ্ন।' কিন্তু তারপর, চারদিকে যখন আরেকরকম বড়ো আগুন উঠল জ্বলে, 'রাজা'র যুদ্ধ আর 'ঘরেবাইরে'র দাঙ্গা, তখনই সুদর্শনার মনে হতে পারে 'আমার মৃত্যুই ভালো ছিল', আর বলতে পারে বিমলা 'কেবলই মনে হতে লাগল আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে।' সুবর্ণকে দেখে একদিন কী-ভাবে মুগ্ধতা এসেছিল, সেই ভাবনায় বিস্মিত সুদর্শনা, আর বিমলারও একদিন বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায় সন্দীপকে দেখে, মনে হয় 'আজ সকালের আলোয় তার যে মুখ দেখলুম তাতে প্রতিভার জাদু একটুও ছিল না।' মরতে হয় না

তাদের কাউকেই অবশ্য, অনেক আঘাতের মধ্য দিয়ে একদিন তারা চিনে নেয় জীবনের সত্য মানে।

তবু, নাটক আর উপন্যাসের প্রয়োজনে দুই গল্পের বিন্যাসে প্রভেদও করতে হয় কতটা! আর গানে সে কি পাল্‌টে যাবে না আরো? অনুভবের যে শুদ্ধ নির্যাস আমরা আশা করি অল্প-অবকাশের কোনো গানে, মুহূর্তের যে ভর চাই, নাটকের ব্যাপ্ত জটিলতার ধরনেই তো কথাগুলি আসতে পারে না সেখানে। গানের নাটক বা গানের সংঘাত যে তাই চলতে চাইবে একটু ভিন্ন চালে, সে তো স্বাভাবিক। তাই, 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো' (যে-পঙ্‌ক্তির শেষ পূর্ণযতিটি লক্ষ করবার) যদি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সুদর্শনার আর্তি, ঠিক তার পরেই 'বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো'কে যেন আমরা ভাবতে পারি সুরঙ্গমারই কথা। দ্বিতীয় স্তবকে 'বেদনাদূতী'র গানকে আমরা ভাবতে পারি সুরঙ্গ-মারই গান, যখন সে বলছে 'ওরে প্রাণ, তোমার লাগি জাগেন ভগবান', যখন সে বলছে 'নিশীথ ঘন অন্ধকারে / ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে / দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।' আবার অন্যদিকে, তৃতীয় স্তবকে, যখন মেঘভরা গগনতল থেকে বাদলজল পড়ছে ঝরে-ঝরে, 'এ ঘোর রাতে কিসের লাগি / পরান মম সহসা জাগি / এমন কেন করিছে মরি মরি', তখন আবার আমরা শুনতে পাই সুদর্শনারই প্রতীক্ষাব্যাকুলতা। এইভাবে, এই গানেও আসে, 'রাজা'রই মতো, 'নিবিড় নিশা নিকষঘন কালো', এ-গানেও আসে এই আহ্বান 'পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো'।

কখনো পঙ্‌ক্তি-পরম্পরায়, কখনো গানের পরম্পরায়, কখনো-বা বইয়ের পরম্পরায় চলতে থাকে কবির মনের ভিতরকার এমনি

এক নাটকীয় গতি। 'গীতালি'র একটি 'ব্যতিক্রমী' গানের উল্লেখ করেন আইয়ুব: 'সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের পর্দাখানি / ডেকে গেল নিশীথরাতে কে না জানি', তিনি দেখেন এর মধ্যে এক অশুভ লগ্নের দূরাগত গম্ভীর শব্দ, দুঃস্বপ্নপীড়িত মানুষের কান্না, আর প্রশ্ন তোলেন, 'নীড়ভাঙা তরীডোবা সব ভাগ্যহত-মানুষের ভয়ার্ত চিৎকারে তিনি কার ডাক শুনতে পাচ্ছেন — ঈশ্বরের, না অনীশ্বরের?' এই গানের ইতিহাসটি গণ্য করলেও হয়তো আমরা বুঝতে পারব, মনের কোন্ পদ্ধতিতে কবি অতিক্রম করে যান স্তরের পর স্তর, আর্তি থেকে কীভাবে পৌঁছন সমর্পণে। গানটি লেখা হয়েছিল ১৩২১ সালের একুশে আশ্বিনে, কিন্তু ওই একই দিনে এরপর আরো তিনটি গান তিনি লিখেছিলেন দেখতে পাই। যেন মনে হয়, এই সবক'টি গান না-লিখে সেদিন উপায় ছিল না তাঁর। কবিতার এক লাইন যেমন অনিবার্যভাবে টেনে আনে তার প্রতিমুখী আরেক লাইনকে, দুটিতে মিলে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে যেমন কোনো কথা, এখানেও এক গান যেন তেমনি অনিবার্যতায় টেনে আনছে পরের গান, চতুর্থটি পর্যন্ত গিয়ে তবে আমরা পৌঁছই কোনো সমে।

দুঃস্বপ্নের আর্তবাণীতে জেগে উঠছে সেদিনকার প্রথম লেখা। 'নিশীথে কী কয়ে গেল মনে, কী জানি কী জানি'র মতো সরল আবেগ এর নয়। এখানে যে 'ডেকে গেল নিশীথরাতে কে না জানি' তার মধ্যে পাষাণতীরে 'বোঝাই-তরী' ডুবে যাবার কথা আছে, আছে নীড়ের মধ্যে ভয়ের কথা। কিন্তু সেইজন্যেই, ঠিক পরের নিশ্বাসেই, ঠিক পরের লেখাতেই তাঁকে বলতে হয়, 'ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে / কোন্ অতিথি, ফিরিয়ে দেব না রে।' এইখানেই সুদর্শনা-

সুরঙ্গমার নাটকটি দেখা দিতে থাকে আবার। সঙ্গে থাকেন ঠাকুরদাও, যখন শুনি :

আমার যদি শক্তি নাহি থাকে
ধরার কান্না আমায় কেন ডাকে?
দুঃখ দিয়ে জানাও রুদ্র
ক্ষুদ্র আমি নই তো ক্ষুদ্র,
ভয় দিয়েছ ভয় করিনে তারে।

ঠিক, 'রাজা' নাটকেও ঠাকুরদা বলেছিলেন সুদর্শনাকে, 'চিনে নিয়েছি যে, সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি, এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।' প্রথম গানে যে ছিল 'ধরণীর বক্ষ টুটে' এক 'রোদনে'র ছুটে আসার কথা, তাকে তাহলে ফিরতে দেবেন না কবি, সে-কান্নার ডাকে এক তাৎপর্য খুঁজে পাবেন আজ, আর তাই তৃতীয় লেখাটিতে স্পষ্ট হয়ে আসে নিজের কাজ, আত্মচরিত্র, বলতে হয় তাঁকে এবার, 'আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।' এবার এ-পথে এসে মিলবেন সবাই, বলবেন সুদর্শনা 'পথে বের করে তবে ছাড়লে। ...চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি, কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি।' যে-ব্যথার কথা বলা হয়েছিল, জীবনের সেই ব্যথাতেই তো

কত যুগের রথের রেখা
বক্ষে তাঁহার আঁকে লেখা
কত কালের ক্লান্ত আশা
ঘুমায় তাহার ধুলার আঁচল পাতি।

তবু সেই কঠিন পথেরই ভালোবাসায় আত্মস্থ হতে পারেন বলে কবি এবার গাইতে পারেন তাঁর চতুর্থ গান : 'বৃন্ত হতে ছিন্ন করি

এক নাটকীয় গতি। 'গীতালি'র একটি 'ব্যতিক্রমী' গানের উল্লেখ করেন আইয়ুব: 'সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের পর্দাখানি / ডেকে গেল নিশীথরাতে কে না জানি', তিনি দেখেন এর মধ্যে এক অশুভ লগ্নের দূরাগত গম্ভীর শব্দ, দুঃস্বপ্নপীড়িত মানুষের কান্না, আর প্রশ্ন তোলেন, 'নীড়ভাঙা তরীডোবা সব ভাগ্যহত-মানুষের ভয়ার্ত চিৎকারে তিনি কার ডাক শুনতে পাচ্ছেন — ঈশ্বরের, না অনীশ্বরের?' এই গানের ইতিহাসটি গণ্য করলেও হয়তো আমরা বুঝতে পারব, মনের কোন্ পদ্ধতিতে কবি অতিক্রম করে যান স্তরের পর স্তর, আর্তি থেকে কীভাবে পৌঁছন সমর্পণে। গানটি লেখা হয়েছিল ১৩২১ সালের একুশে আশ্বিনে, কিন্তু ওই একই দিনে এরপর আরো তিনটি গান তিনি লিখেছিলেন দেখতে পাই। যেন মনে হয়, এই সবক'টি গান না-লিখে সেদিন উপায় ছিল না তাঁর। কবিতার এক লাইন যেমন অনিবার্যভাবে টেনে আনে তার প্রতিমুখী আরেক লাইনকে, দুটিতে মিলে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে যেমন কোনো কথা, এখানেও এক গান যেন তেমনি অনিবার্যতায় টেনে আনছে পরের গান, চতুর্থটি পর্যন্ত গিয়ে তবে আমরা পৌঁছই কোনো সমে।

দুঃস্বপ্নের আর্তবাণীতে জেগে উঠছে সেদিনকার প্রথম লেখা। 'নিশীথে কী কয়ে গেল মনে, কী জানি কী জানি'র মতো সরল আবেগ এর নয়। এখানে যে 'ডেকে গেল নিশীথরাতে কে না জানি' তার মধ্যে পাষাণতীরে 'বোঝাই-তরী' ডুবে যাবার কথা আছে, আছে নীড়ের মধ্যে ভয়ের কথা। কিন্তু সেইজন্যেই, ঠিক পরের নিশ্বাসেই, ঠিক পরের লেখাতেই তাঁকে বলতে হয়, 'ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে / কোন্ অতিথি, ফিরিয়ে দেব না রে।' এইখানেই সুদর্শনা-

সুরঙ্গমার নাটকটি দেখা দিতে থাকে আবার। সঙ্গে থাকেন ঠাকুরদাও, যখন শুনি :

আমার যদি শক্তি নাহি থাকে
ধরার কান্না আমায় কেন ডাকে ?
দুঃখ দিয়ে জানাও রুদ্র
ক্ষুদ্র আমি নই তো ক্ষুদ্র,
ভয় দিয়েছ ভয় করিনে তারে।

ঠিক, 'রাজা' নাটকেও ঠাকুরদা বলেছিলেন সুদর্শনাকে, 'চিনে নিয়েছি যে, সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি, এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।' প্রথম গানে যে ছিল 'ধরণীর বক্ষ টুটে' এক 'রোদনে'র ছুটে আসার কথা, তাকে তাহলে ফিরতে দেবেন না কবি, সে-কান্নার ডাকে এক তাৎপর্য খুঁজে পাবেন আজ, আর তাই তৃতীয় লেখাটিতে স্পষ্ট হয়ে আসে নিজের কাজ, আত্মচরিত্র, বলতে হয় তাঁকে এবার, 'আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।' এবার এ-পথে এসে মিলবেন সবাই, বলবেন সুদর্শনা 'পথে বের করে তবে ছাড়লে। ...চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি, কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি।' যে-ব্যথার কথা বলা হয়েছিল, জীবনের সেই ব্যথাতেই তো

কত যুগের রথের রেখা
বক্ষে তাঁহার আঁকে লেখা
কত কালের ক্লান্ত আশা
ঘুমায় তাহার ধুলার আঁচল পাতি।

তবু সেই কঠিন পথেরই ভালোবাসায় আত্মস্থ হতে পারেন বলে কবি এবার গাইতে পারেন তাঁর চতুর্থ গান : 'বৃন্ত হতে ছিন্ন করি

শুভ্র কমলগুলি / কে এনেছে তুলি।' তন্দ্রাবিহীন দিশাহারা একটি তারা আর আঁধার রাতের ভয়ার্ত যে নীড় ছিল প্রথম গানটিতে, চতুর্থ এই রচনায় তা তবে এসে পৌঁছল এই শুভ্র কমলের কাছে, যেখানে 'শেষ নিমেষের পেয়ালা ভরা অম্লান সান্ত্বনা।' এই চারটি গানের মধ্য দিয়ে যে পর্যায়-পরিক্রমা আছে, 'রাজা' নাটকের শেষে সুরঙ্গমার একটিমাত্র গানের সঞ্চারী আর আভোগে পাঁচটি চরণের মধ্যে সেই একই কথা কি নেই ?—

যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চলো সাথে।

এরও প্রথমে পাই আলোহীন নিশীথের ভয়, তার পরেই এক ধ্রুব তারার জ্বলে ওঠা, ('গীতালি'তে যা 'ঝড়ের হাওয়ায় ব্যাকুল বাতি / আগুন দিয়ে জ্বালব বারে বারে') তারপরে পথ, আর তারও পরে এক প্রাপ্তির বোধ, এক তৃপ্তির বোধ : 'তোমারি সুগন্ধশ্বাসে সকল চিত্ত ভরি' আর 'এরা আমার মর্মে তব করুণ অঙ্গুলি।'

সংশয়ের আঘাত বড়ো হয়ে এলে এ-প্রাপ্তির বোধ অবশ্য হারিয়ে যেতে চায় কখনো-কখনো, জীবনের প্রান্ত-মুহূর্তগুলিতে অনেকসময়ে যেমন ঘটেছে তাঁর। কিন্তু সেখানেও যে একেবারে ছেড়ে দেননি তাঁর সব নির্ভরতা, তেমন ইঙ্গিতও কি প্রায়ই থেকে যায়নি তাঁর গানগুলির মধ্যে ? বলেছিলেন তিনি এক সুধাপারাবারের কথা, ১৯৩৪ সালের এক গানে : 'কাছে থেকে দূর রচিল কেন'। আমার পৃথিবী কেবলই কি আধখানা হয়ে থাকবে,

কুহেলিকার বাধা সরিয়ে চোখ কেন দেখতে পাবে না যে 'সমুখে রয়েছে সুধাপারাবার'? এল সেই সুধা শেষ পর্যন্ত, মহা-অজানার নির্ভয় পরিচয়ের কথা বললেন তিনি মৃত্যুর দেড় বছর আগেও, সামনে দেখলেন এক 'শান্তিপারাবার'। বাহাত্তর বছর বয়সের গানে এ-প্রশ্ন করেছেন বটে 'পার আছে কোন্ দেশে', বলেছেন বটে হালভাঙা পালছেঁড়া ব্যথার নিরুদ্দেশ চলার কথা, কিন্তু সাতাত্তর বছর বয়সে বলতে পেরেছেন তেমনি, 'অচিনকূলে পাড়ি দেব / আলোকলোকে জন্ম নেব / মরণরসে অলখঝোরায় প্রাণের কলস ভরতে।' লিখেছেন ১৯৩৭ সালেও এক মঙ্গল-আলোকের কথা: তোমার স্নেহচোখের সামনে আমার দীপ্ত শোক যে পৌঁছয় এক অমৃতময় লোকে, বলেছেন তার কথা। 'যুগান্তের বহ্নিস্নানে যুগান্তরদিন / নির্মল করেন যিনি, করেন নবীন, / ক্ষয়শেষে পরিপূর্ণ করেন সংসার' তাঁকে তিনি নমস্কার জানিয়েছেন এই পঁচাত্তর বছর বয়সেরও গানে। 'দিনান্তবেলায় শেষের ফসল' নিয়ে যাবার সময়ে তিনি শোনেন শুধু 'মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে', নির্মম ভাগ্যের 'তামসী তুলিকা'য় আচ্ছন্ন মানুষের জন্য তিনি আশা করে থাকেন 'শ্রান্ত দুঃখের মৌন তিমিরে শান্তির দান।'

সমকালীন অন্যান্য ভাবনার সঙ্গে যদি এর কোনো আপাত-বিরোধ দেখা দেয়, তবে কি গানের এই সাক্ষ্যকে একেবারেই তুচ্ছ করব আমরা? 'গানের ভিতর দিয়ে অব্যবহিত আনন্দের সহজ বোধে'র যে-কথা রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলেন আমাদের, প্রায়ই বলেন যে গানের মধ্যেই আছে তাঁর নিজের জায়গা, বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালার হাত থেকে পালাবার মতো আশ্রয়, সে-কথা শুনে নেবার পর তাঁর অন্তিম জীবনের এই গানক'টির কথা কি ভাবতেই

হয় না আমাদের? মনে হয় না কি, তাঁর অন্ত্যকালীন রচনায় এ-ও হলো সংলাপের এক অন্য ধরন, কবিতার সঙ্গে গানের এক সংলাপ? কবিতার শব্দে যে-সংশয় অনেকসময়ে দুলে উঠছে সামনে, দাঁড়িয়েছেন ভয়ার্ত এক নিরর্থকতার মুখোমুখি, গানের মধ্য দিয়ে যেন তারই নিভৃত কোনো উত্তর খুঁজে নিয়েছেন কবি, রেখে দিয়েছেন শান্তির কোনো কেন্দ্র। যদি এ-কথা সত্যি হয় যে গানের মধ্যেই আছে তাঁর অন্তরতম প্রকাশ, যদি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব এই ধারণার কোনো মানে থাকে যে গানই তাঁর বেঁচে থাকবার শেষ জায়গা, তাহলে মনে হয় যে, 'গীতাঞ্জলি'র পর্বে যে-আত্মবোধ আর আত্মশক্তির উপার্জন ঘটেছিল তাঁর, সেই বোধ আর শক্তি ছড়ানো ছিল তাঁর প্রান্তিক জীবনেরও মজ্জার ভিতরে। সেইজন্যই, পশ্চিম মহাদেশের যে 'ঝলসানো তাপে অন্নবিস্তর দগ্ধ হলো সারা দুনিয়ার মানুষ', যার 'দুঃখের ও পাপের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ দেখে শিউরে উঠলেন ভক্ত-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ', তার প্রবল আঘাতের পরেও তিনি বলতে পারেন 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই', বলতে পারেন 'ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ।' মৃত্যুর দিকে আরো কিছুটা এগিয়েও, দুঃখ ও পাপের আরো কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার পরেও, তাঁর চোখের সামনে থাকে সেই 'নাচের লহরী' যেখানে

> যদি কাটে রশি, যদি হাল পড়ে খসি
> যদি ঢেউ ওঠে উচ্ছ্বসি
> সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,
> করিনে ভয় – নেবই তারে, নেবই তারে জিতে।

গানের ভিতর দিয়ে দেখে জীবনকে একভাবে চিনতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যুদ্ধশেষেই লিখেছিলেন 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি

ভুবনখানি / তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।' সেই গানেরই ভিতর দিয়ে যদি আমরা বুঝতে চাই তাঁকে, তাহলে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবেন তা নয়, তাহলে আমরা কেবল দেখতে পাব তাঁর সম্পূর্ণতর আর গভীরতর এক অবয়ব, অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সরল সাদৃশ্য আছে যার অনেক, আপাতবিরোধও আছে কখনো-কখনো। কিন্তু সমস্ত এই বিরোধ-সাদৃশ্য তাঁর রচনায় পৌঁছে যায় এক অন্তিম সামঞ্জস্যে, সমগ্রের এক ডিজাইনে, যেখানে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে পারেন 'তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।'